মানস-কমল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
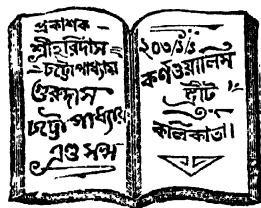
এক টাকা

চৈত্র—১৩৩২
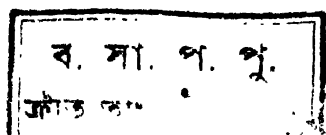
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

*

* *

মনের কথা মনের কোণে
গোপন যে আর রইল না,
মানস-কমল উঠ্‌ল ফুটে'
বারণ কোনই মান্‌ল না।
তোমার কাছে আমার কথা
গোপন কিছু নাইকো আর,
দিলাম 'কমল' তোমার হাতে
জানি, আদর হবেই তার!

* *

*

মানস-কমল

মানস-কমল

দেবতা

(১)

দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার। দূর পল্লীগ্রামে বসতি। গৃহকর্ত্তা যোগেন্দ্রনাথ সপ্তবিংশবর্ষীয় যুবা, কলিকাতার কোন জাহাজ কোম্পানীর অফিসে কার্য্য করে। বাড়ীতে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী স্ত্রী ও এক বৎসরেব শিশু পুত্র, প্রৌঢ়া খুড়িমার তত্ত্বাবধানে থাকে। সাত দিনের

ছুটি লইয়া যোগেন্দ্র এক মাস পরে বাড়ী আসিয়াছে। কলিকাতায় ফিরিয়া এবার তাহাকে জাহাজে করিয়া সিঙ্গাপুর, পিনাং প্রভৃতি নানা স্থানে যাইতে হইবে, ফিরিতে তিন মাস সময় লাগিবে। দেশ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব-দিন রাত্রে শয়ন করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

সরু, তিন মাস দেখ্‌তে পাবে না, খুব কষ্ট হবে, নয়?

সে আমি না বল্‌লে যেন বুঝতে পার না!

বুঝতে পারি বৈ কি। এবার ঘুরে এসেই কিন্তু, তোমার ইচ্ছে-মত ব্যবস্থা কর্‌বো।

ঠিক করা চাই কিন্তু। আমার এখানে একা থাকৃতে আর মোটে ভাল লাগে না।

যোগেন্দ্র সরযূকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া বলিল, একা কি রকম? খোকা রয়েচে, খুড়িমা রয়েচেন……

তা হলেই বা, আসল যে থাকে না। সত্যি সত্যি আমার বড় কষ্ট হয়।

কষ্ট হয় বলেই ত এবারে জাহাজে কাজ নিয়ে যাচ্চি। এক ক্ষেপ ঘুরে এলে অন্ততঃ তিন শ টাকা উপায় হবে। হাতে কিছু জমাতে না পারলে যে ভরসা হয় না!

দেবতা

তিন শ টাকা পাবে, মাইনে ছাড়া ?

তা না হলে আর সেধে কাজটা নিলুম !

তবে এবার আমার ইচ্ছে ঠিক পূরবে, নয় ? কত দিন থেকে তোমায় বলচি……

ষাট টাকা মাইনেতে সাহস হয় না বলে নিয়ে যেতে পারি না। হাতে কিছু থাকলে তবে সাহস হবে।

আমায় নিয়ে গেলে দেখো আমি কি রকম কম খরচায় সংসার চালাবো। ঝি-টী কিচ্ছু রাখতে হবে না।

কম হলেও ত মাইনের টাকাটা সব লাগবেই। ছোট্ট খোলার বাড়ীও পনের ষোল টাকার কমে ত পাওয়া যাবে না। তার পর বাকি টাকাটা খাই-খরচ ইত্যাদিতে ফুরিয়ে যাবে।

খোকা কাঁদিয়া উঠিল। সরযূ তাড়াতাড়ি স্বামীর বাহুবেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া খোকাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইল। খোকার কান্না থামাইতে গিয়া তাহাদের আগেকার কথা চাপা পড়িয়া গেল।

(২)

খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া সরযূ স্বামীর দিকে ফিরিতেই, যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা সর, আমার ওপর ভালবাসা তোমার যেন আগের চেয়ে কমে গেছে, নয় ?

কিসে বুঝ্‌লে ?

কেন, ঐ যে একজন ভাগীদার হয়েচে।

তাহলে তোমারও কমেচে বল ?

আমার কেন কম্‌বে ?

বাঃ, তুমি যেন খোকাকে ভালবাস না !

ভালবাসি বৈ কি, তা বলে অতটা নয়।

অতটা নয় বল্‌লেই কি না আমি বিশ্বাস কর্‌বো !

আচ্ছা, অতটা ভালবাস কেন ?

তোমার ছেলে যে, সেইজন্যে।

ওঃ, তাই না কি ? তা আমি জানতুম না।

দুষ্টু—বলিয়া সরযূ স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

কদিন অন্তর চিঠি দেবে ?

সপ্তাহে একখানা ত পাবেই।

নিশ্চয়ই, তা না হলে বড় ভাব্‌বো।

কিন্তু তোমাদের ত চিঠি পাবো না, কখন কোথায় থাক্‌বো তার ত ঠিক নেই।

আমাদের জন্যে ভাবনা কি ? আমরা ত বাড়ীতেই থাক্‌বো।

এ রকম সুন্দরী স্ত্রীকে একা রেখে কখনও নির্ভাবনায় থাকা যায় ?

ভারী ত সুন্দরী······

সরযূ স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইতে, যোগেন্দ্র আবেগভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

(৩)

প্রায় তিন মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রের ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়া আসিল। সরযূ যে কি করিয়া দিন কাটিতেছে, তাহা কেবল এক অন্তর্য্যামীই জানেন। যোগেন্দ্রের দেশত্যাগের পর-দিন রাত্রেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক দুর্বৃত্ত লম্পট যুবক কয়েকজন অনুচরের সাহায্যে সরযূকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। গ্রামবাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়া দুই দিন পরে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে। দীর্ঘ দুইমাস ধরিয়া মকদ্দমা চলার পর দুর্বৃত্ত লম্পটের ও তাহার সহকারীদের কয়েক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমার সময় জেলার সদরে সরযূ এক সহৃদয় উকিলের আশ্রয়ে ছিল। অল্প কয়েক দিন হইল নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিলেও, নিজ আবাসে তাহার স্থান হয় নাই। নারী-জীবনের সার

দেবতা

সতীত্ব যখন নষ্ট হইয়া গেল, তখন কি করিয়া তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া যাইতে পারে? সমাজপতিরা দয়া করিয়া তাহাকে গ্রামের প্রান্তে, স্বামীপরিত্যক্তা, আত্মীয়স্বজনহীনা এক বৃদ্ধার আশ্রয়ে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। ধর্ষিতা যুবতী সর্ব্বদা চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কোন রকমে দিন কাটাইতেছে। তাহার সে স্বর্ণ-কান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একমাত্র সন্তানকে নিকটে পাইলেও মনের কতকটা শান্তি হইতে পারিত, কিন্তু সমাজপতিরা সে অধিকার হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া সরযূ আশ্রয়দাত্রীর সহিত কথা কহিতেছিল।

বামন-পিসি, খোকাকে একবারটি যদি লুকিয়ে আনতে পারেন?

বৃথা চেষ্টা মা, তোমার কাছে তাকে আর দিচ্চে না।

এ শাস্তি কেন, আমার কি দোষ পিসিমা?

দোষ, মেয়ে-মানুষ হয়ে জন্মেছ এই দোষ।

পিসিমা, এ রকম করে যে আমি থাকতে পারবো না।

কি করবে মা, ঘরে তোমাকে ত আর স্থান দেবে না।

তাঁর যে ফিরে আসবার সময় হয়ে এলো, তিনি ফিরে এলে নিশ্চয়ই এর সুবিচার করবেন।

পুরুষের কাছে এর কোন সুবিচারের আশা নেই মা।

তিনি যে আমায় খুবই ভালবাসেন পিসিমা। কখনও আমার একটা সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারেন না।

তোমার বয়সে আমারও ঐ ধারণা ছিল মা। ভালবাসার কোন মূল্য নেই, কোন মূল্য নেই; তা থাকলে আমাকে এই চল্লিশ বছর এত দুর্দ্দশা ভোগ করতে হোত না।

পিসেমশাই কি আপনাকে খুব ভালবাসতেন?

খুব—, মনে হোত জগতে কোন স্বামী বুঝি কোন স্ত্রীকে এত ভালবাসতে পারে না।

তবে এ রকম হোল কেন?

কেন? আমি যে মেয়েমানুষ, এই জন্যে। তোমারই মত আঠার কুড়ি বছর বয়সে, স্বামীর এক আত্মীয় এক দিন আমার ওপর অত্যাচার করে। স্বামী তখন কি কাজের জন্যে সহরে গেছ্‌লেন। তিনি ফিরে আসতেই তাঁকে সব কথা জানাই। তিনি আমায় পরিত্যাগ করলেন। কত অনুনয়-বিনয় না করলুম,—এত ভালবাসা কোথায় তলিয়ে গেল। তবে এইটুকু ভাল ছিল যে, বাইরের লোকে এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারে নি। অনেকে মনে করে নিলে যে, ছেলে-পিলে হয়নি বলে স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করেচে। বাপের শূন্য ভিটেয় এসে আশ্রয় নিলুম। এ আশ্রয়টুকু না থাকলে কোথায় যে দাঁড়াতুম,

তা এক ভগবানই বলতে পারেন। তোমার যে মা আরও বিপদ, দেশশুদ্ধ লোক যে জেনে গেছে, তোমার ওপর অত্যাচার হয়েচে— তোমার সতীত্ব নষ্ট হয়েচে। স্বামীর কাছে কোন সুবিচার পাবে না মা, কোন সুবিচার পাবে না।

বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল। সরযূর সমস্ত আশা যেন এক নিমেষে ভবিষ্যতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

(৪)

যোগেন্দ্র তিন মাস পরে কলিকাতায় পৌঁছিয়াই পরদিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সাধের সংসারে যে একটা বিষম ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও সে জানিতে পারে নাই। বাড়ীতে পা দিতেই খুড়িমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রন্দনের সুরের সঙ্গে যে কথাগুলি অস্পষ্টভাবে বাহির হইল, তাহাতে কতকটা অনুমান করিয়া যোগেন্দ্র বুঝিল যে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহারা সরযূকে হারাইয়াছে। যোগেন্দ্রের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল,—মাথায় হাত দিয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। খুড়িমার চীৎকারে খোকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্য হইতে তাহার ক্রন্দন-শব্দ বাহিরে আসিতেই, খুড়িমা তাহাকে তুলিয়া আনিয়া যোগেন্দ্রের কোলে ফেলিয়া দিলেন। যোগেন্দ্র খোকাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

পার্শ্বেই সমাজপতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের আবাস। যোগেন্দ্রের আসার সংবাদ পাইয়া তিনি সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ বিপদে যোগেন্দ্রকে সান্ত্বনা দান যে তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। যোগেন্দ্র মন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"কি করবে বাবা, ঘটনাচক্রের ওপর ত মানুষের কোন হাত নেই। তবে ছুঁড়িটার যাতে খাওয়া থাকার কষ্ট না হয়, আমরা তার ব্যবস্থা করেচি। মোক্ষদার কাছেই তাকে রাখা হয়েচে। বাড়ীতে ত আর কিছুতেই তাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে না।"

তবে কি তাহার সরযূ এখনও বাঁচিয়া আছে! যোগেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজ্ঞে কি বলচেন?

"বলচি, মেয়েমানুষের যখন একবার সতীত্ব নষ্ট হয়েচে, তখন কি আর তাকে সমাজের ভেতর স্থান দেওয়া যায়। তাকে ত্যাগ করতেই হবে; তা না হলে যে সমাজ একেবারে রসাতলে যাবে।"

যোগেন্দ্রের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, সে এখনও ঘটনাটার বিষয় জানিতে পারে নাই। তিনি তখন তাহাকে সরযূকে হরণ করা হইতে, তাহার উদ্ধার, মকদ্দমার কথা, দুর্বৃত্তদের সাজার কথা, মোক্ষদার গৃহে আশ্রয় দান প্রভৃতি সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। যোগেন্দ্র মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শুনিয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"ছুঁড়িটা ছেলেটার জন্যে একবারে পাগল! মোক্ষদা যে আমার কাছে কতবার এসে বলেচে, দাদাঠাকুর, ছেলেটা দিয়ে দিন, তা না হলে ছুঁড়িটা বাঁচে না। কি করে দি বল, ওরও ত ভবিষ্যৎটা দেখতে হবে। এখন দিলে ভবিষ্যতে ওটারও যে সমাজে স্থান মিলবে না, কি বল বাবা?"

যোগেন্দ্র এতক্ষণ পরে মুখ খুলিল; বলিল—"জেঠামশায়, খোকাকে ওর কাছে পাঠিয়েই দিন।"

"তা তোমার ইচ্ছে যখন বাবা, কালই পাঠিয়ে দেবো! বুঝেচি, তুমি ও-সংশ্রবই একেবারে ত্যাগ করতে চাও। সে ভাল কথাই। আমরা মনে করেছিলুম কি, ছেলেটাকে হয় ত তুমি রাখবে, সেইজন্যেই দিই নি। তা বাবা, তোমার ভাবনা কি, এক মাসের মধ্যেই আমি আবার তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো। আজকালকার দিনে এ রকম ছেলে পাওয়া মেয়ের বাপের ভাগ্যির কথা। যাও বাবা, অনেক রাত্তির হয়েছে, কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়গে। ঘটনাচক্রের ওপর মানুষের ত হাত নেই।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন। যোগেন্দ্র উঠিয়া ঘুমন্ত শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নিজের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

(৫)

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি। মোক্ষদা দেবী ঘুমাইতেছিলেন, সরযূ জাগিয়া বসিয়া ছিল। দুইদিন খোকাকে কাছে পাইয়া, সরযূকে বাহিরে কতকটা যেন শান্ত দেখা যাইলেও, মনের ভিতরে তাহার যে বিষম অশান্তির ঝড় বহিতেছিল, মোক্ষদা দেবীও তাহা ততটা বুঝিতে পারেন নাই। যোগেন্দ্র ফিরিয়া আসিলে, নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সুবিচার হইবে, এই আশায় যে সে এত দিন বুক বাঁধিয়া ছিল। সে আশা যে তাহার নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্র বাড়ী আসিয়া পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে,—একবার তাহার কোন খোঁজ লওয়াও আবশ্যক বোধ করে নাই। তাহার সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য ছেলেটাকে পর্য্যন্ত নিজেদের কাছ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে। শেষে কি আত্মহত্যা করিবে—সরযূ তাহাই ভাবিতেছিল।

মানস-কমল

"সর—"

চিরপরিচিত কণ্ঠের সুমধুর ডাকে সরযূ ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত ক্ষুদ্র আঙ্গিনার মধ্যস্থলে যোগেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"সর, তোমাদের নিতে এসেচি। কলকাতায় বাড়ী ঠিক করেচি, কাল ভোরেই আমরা গ্রাম ছেড়ে যাবো।"

সরযূ বাঞ্ছিতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, তাহার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

(৬)

পর দিন প্রভাতেই মোক্ষদা দেবী আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়কে খবর দিলেন—"ভোরের গাড়ীতে যোগেন সরযূকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে।"

"বল কি? নিয়ে গেল!"

"মেয়েটার খুব পুণ্যির জোর দাদাঠাকুর, তা না হলে, অমন স্বামী পায়।"

"বল কি? ঐ ছুঁড়িটাকে নিয়ে আবার ঘর করবে। যোগেনের কি একটুও মনুষ্যত্ব নেই, ওটা কি মানুষ নয়!"

"মানুষ নয় দাদাঠাকুর—দেবতা।"

গাঙ্গুলী মহাশয় হাঁ করিয়া মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ছবির খেয়াল

সমস্তদিন নানাকার্য্যে ঘুরিয়া যখন বাটী ফিরিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। বিশেষ ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, বৈঠকখানায় না বসিয়া উপরে নিজের ঘরে আসিলাম। জুতা জামা ছাড়িয়া, দক্ষিণের জানালাটার ধারে ইজিচেয়ারখানা পাতিয়া বসিতে, বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছিল। ক্লান্তদেহে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থা, আবার মৃদু-মন্দ বাতাস—চক্ষু যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। সম্মুখের দেওয়ালে একখানি অবাঁধা ছবি টাঙ্গান ছিল; বাতাস লাগিয়া সেখানি ঈষৎ দুলিতেছিল। অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে সেখানির দিকে চাহিয়া ছিলাম। ছবিতে, পুষ্পোদ্যানের মধ্যে সুন্দরী

ছবির খেয়াল

কিশোরী মালা হস্তে একাকিনী দণ্ডায়মানা, বোধ হয় প্রিয়জনের আগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। মনে হইতেছিল, যেন কিশোরী আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতেছে, আনন্দের আতিশয্যে তাহার সমস্ত দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*

তোমায় কি বোলে ডাক্‌বো ?

কেন, ছবি বোলে।

ছবি, এতদিন কেন আমায় ডাক নি ?

সময় না হ'লে তুমি আস্‌বে কেন ?

আস্‌তুম না, কি কোরে জান্‌লে ?

এ যে জানা কথা।

এই যে তবে আজ এসেচি।

আজ যে আস্‌বার দিন, আসতেই হবে।

তা হলে তুমি জান্‌তে আমি আস্‌বো ?

নিশ্চয়ই, এই দেখ্‌চ না তোমার জন্যে মালা গেঁথে রেখেচি।

তবে দাও গলায় পরি।

বাঃ, তুমি বুঝি নিজে পরবে, আমি পরিয়ে দিচ্চি।

দাও।

বাঃ, কেমন সুন্দর দেখাচ্চে!

কেন এতক্ষণ বুঝি খারাপ দেখাচ্ছিল?

যাও, আমি বুঝি তাই বলচি!

তুমি তো মালা দিলে, আমি কি দিই?

তোমার যা ইচ্ছে।

আচ্ছা এই নাও—

তুমি ভারী দুষ্টু!

কেন, জিনিষটা পছন্দ হোল না বুঝি?

চল, বেড়িয়ে আসি।

চল, কোন্ দিকে?

সামনের দিকে? দেখ্‌চ না কত আলো।

অত আলো কেন?

আমরা ওদিকে যাব বোলে।

চার ধারের শোভা তো বেশ, যেন বসন্তকাল।

এখানে যে সব সময় বসন্ত।

ছবির খেয়াল

এত ফুল তো এক সঙ্গে ফুট্‌তে দেখি নি।

এই তো ফোটবার সময়!

কোকিল ডাকৃচে।

শুন্‌তে পাচ্চি।

সামনে ওটা কি?

ওটা যে লতা-কুঞ্জ।

চল, ঐখানে যাই।

ঐখানেই তো যাচ্চি।

অতি সুন্দর লতা তো।

এখানে তো সবই সুন্দর।

বাঃ, বেশ বসবার জায়গা তো।

এস আমরা বসি।

পাতার ফাঁক দিয়ে আলো ঠিক তোমার মুখের ওপর পড়েচে

তোমার মুখেও তো পড়েচে, বড় সুন্দর দেখাচ্চে।

—এ মুখের কাছে তো নয়।

যাও!

ও কি, চোখ বুজ্‌লে কেন?

ইচ্ছে হো'ল।

খুলবে না ?

না।

তবে এই—শাস্তি।

তুমি ভারী দুষ্টু।

চোখ খুল্‌লে যে ?

ইচ্ছে হো'ল।

কতগুলো ফুল ঝরে পড়'ল দেখ্‌চ ?

দেখ্‌চি।

তোমার চুলে সাজিয়ে দি।

দাও।

বাঃ, বেশ দেখাচ্চে।

যাও !

আবার চোখ বুজলে কেন ?

জানি না।

তবে এই আর একটা—

বসতে দিলে না।

আমি কি উঠ্‌তে বল্‌লুম।

চল, বেড়াই।

ছবির খেয়াল

কোন্ দিকে যাবে ?
যে দিকে তোমার ইচ্ছে।
চল, ঐ রাস্তাতেই ফিরি।
চল, তোমার যা ভাল লাগে।
আবার কোকিল ডাক্‌চে।
ও তো বরাবরই ডাক্‌চে।
তোমার মাথায় ফুলগুলো বড় সুন্দর দেখাচ্চে।
ও যে তুমি সাজিয়ে দিয়েচ।
অত আস্তে চল'ছ কেন ?
রাস্তা যে ফুরিয়ে এলো।
আলো একটু কমে গেল নয় ?
তাই তো দেখ্‌চি।
এই যে আমরা এসে পড়েচি।
এত শীগ্‌গীর !
ছবি ?
কি ?
এইবার যেতে হবে।
এখনি যাবে ?—ছবি প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*　　*

ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো—

বৌদিদির ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো, এ আবার তোমার কি খেয়াল, ছবিখানা বুকে কোরে ঘুমুচ্চো।"

চাহিয়া দেখি, দুই বাহুর মধ্যে ছবি বক্ষ-সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

বাতাসের জোরে ছবিখানা দেওয়ালের পেরেক হইতে খুলিয়া কখন যে আমার বক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম—"বৌদিদি, এ ছবির খেয়াল।"

"তাতো বটেই,—এ তোমার নয়, ছবিরই খেয়াল"—বলিয়া, বৌদিদি হাসিতে হাসিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পতিতা

(১)

প্রভাতে গঙ্গা-স্নান করিতে গিয়া একমাত্র বংশধর সপ্তমবর্ষীয় বালক দুলাল যে কিরূপে আশ্চর্য্য রকমে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যে নারী অপরের সন্তানকে রক্ষা করিতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহার যে কোনরূপ পরিচয় লওয়া হয় নাই সেজন্য উভয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিলেন।

তোমার বড় অন্যায় হয়েচে।

কি কোরবো, আমার কি তখন জ্ঞান ছিল ?

আহা, একটু পরে ত খোঁজ নিলে পার্‌তে।

একটু পরে,—সে যে লোকের ভিড়, তখন যেন ভিড় থেকে বেরুতে পার্‌লেই বাঁচি।

বড্ড অন্যায় হয়েচে, তিনি কি মনে করলেন বলতো?

একবার যদি দেখা পাই তো পায়ে ধরে মাপ চাই।

দেখা আর পেয়েচো! কে,—কোথায় বাড়ী,—ঠিকানা জানলে না, দেখা আর পাবে কি কোরে?

চেষ্টা কোর্‌লে কি আর খোঁজ পেতে পার না?

এতবড় সহরে, দশ লাক লোকের মাঝে একজনের, বিশেষতঃ মেয়ে-মানুষের—খোঁজ করা একেবারে অসম্ভব।

আমার কিন্তু মনে হয়, আবার দেখা পাবই।

ভাল কথা, তখন দোষটা শুধ্‌রে নিও।

কথা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না! বাহির হইতে গৃহিণী ডাকিলেন—"বৌমা!" বধূ চলিয়া গেলেন। স্বামী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা মহীয়সী নারীর খোঁজ পাওয়া যাইতে পারে।

(২)

লোকের ভিড় জমিতে না জমিতেই মালতী গঙ্গার ঘাট পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। পথে দাসী নীরদা শতমুখে দিদিমণির কার্য্যের প্রশংসা করিতেছিল, কিন্তু মালতী তাহার কথার কোন উত্তর দেয় নাই। দুলালকে দেখিয়া অবধি তাহার কেবল নিজের মৃত-পুত্রের কথাই মনে পড়িতেছিল। চেহারার এতটা সাদৃশ্য তাহার চক্ষে আর কখনও পড়ে নাই। এতদিন বাঁচিয়া থাকিলে, তাহার পুত্র নয় বৎসরের হইত। যে সন্তানের জন্মের ফলে তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ঘৃণ্য পতিতার বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, চারি বৎসর পূর্ব্বে মৃত সেই সন্তানের স্মৃতিই আজ তাহার মাতৃ-হৃদয়কে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। মালতী অনেকক্ষণ ধরিয়া আপন মনে ক্রন্দন করিল। নীরদা তাহাকে কোন সান্ত্বনা দিল না। সে মালতীকে ভালরূপেই জানিত। মালতীকে জন্ম হইতে সে মানুষ করিয়াছে। মালতীর দুঃখ কষ্ট সে নিজে অনুভব করিতে

পারিত। যখন পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন সকলেই মালতীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন কেবল সেই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। খানিকক্ষণ ক্রন্দনের পর মনটা একটু হালকা হইলে, মালতীই প্রথমে কথা কহিল।

নীরো, ছেলেটার মুখখানা দেখেছিস্, ঠিক যেন সেই রকম!

তা ও-রকম মিল অনেক সময় হয় দিদিমণি।

এত মিল! চলে এসে অবধি মনে হচ্ছে আবার দেখে আসি!

এখন গেলে কি আর দেখা পাবে দিদিমণি, তারা এতক্ষণ বাড়ী গিয়ে পৌঁছেচে।

কোথায় তাদের বাড়ী বল দিকিন?

তুমি যে তাড়াতাড়ি চলে এলে, একটু জান্‌তেও দিলে না যে, কাদের ছেলেকে বাঁচালে।

ওরে, আমি কি আর দাঁড়াতে পারি, আমার কি দাঁড়াবার মুখ আছে।

একটু দাঁড়ালে আর কি হো'ত।

কি হো'ত! যখন জিজ্ঞেস কোর্‌ত তুমি কে, তোমাদের বাড়ী কোথায়, তখন কি উত্তর দিতুম বল্‌তো?

নীরদা এ কথার আর কোন উত্তর দিল না।

(৩)

পরদিন প্রাতে বাহির হইতে একখানি কাগজ হাতে করিয়া ঘরে আসিয়া ব্রজবাবু স্ত্রীকে বলিলেন—

শুনেচো, যে মাগীটা দুলালকে বাঁচিয়েচে সেটা একটা বেশ্যা!

ও মা, তাই না কি, কি ঘেন্নার কথা।

এই আজকের খবরের কাগজে বেরিয়েচে।

সেই জন্যেই মাগীটা তাড়াতাড়ি ছেলেকে আমাদের কাছে দিয়েই পালিয়ে গেল।

তা ত হবেই, ভদ্রঘরের মেয়েদের কাছে ওরা সাহস করে দাঁড়াতে পারবে কেন!

যাই, মাকে খবরটা দিই গে।

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একমাত্র বংশধর, প্রাণাধিক প্রিয় পৌত্রকে বেশ্যায় স্পর্শ করিয়াছে শুনিয়া, পাছে কোন অকল্যাণ হয় এই আশঙ্কায় গৃহিণী বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কি ব্যবস্থা করিতে হইবে নিজে ঠিক করিতে না পারিয়া, তখনই তিনি পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন।

নীরো, একখানা গাড়ী আনতে পারিস ?

কখন চাই দিদিমণি ?

এখনই ।

এখনই ? কোথায় যাবে দিদিমণি ?

নারকোলডাঙ্গায় ।

কেন, সেখানে আবার কি ?

সেইখানেই তাদের বাড়ী রে নীরো ।

কি কোরে খবর পেলে দিদিমণি ?

এই যে খবরের কাগজে ঠিকানা বেরিয়েচে ।

ঠিকানার জন্যে ভাব্‌ছিলে, দেখ্‌লে হরি কেমন —তোমার মনটাও ঠাণ্ডা হো'ল ।

মনটা এখনও ঠাণ্ডা হয়নি, একবার ছেলেটাকে দেখতে পেলে তবে হবে।

তা খাওয়া দাওয়া হোলে, একটু পরেই গাড়ী আন্‌বো।

না রে খাওয়া দাওয়া কোরে নয়, এখনই যাবো।

এখনই যাবে, এই বেলা দুপুরে, না খেয়ে?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সেখান থেকে ঘুরে এসে খেলেই হবে।

নীরো গাড়ী আনিতে বাহির হইয়া গেল। মালতী কাপড় ছাড়িবার জন্য নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

(৫)

ব্রজকিশোর বাবুর বাড়ীর দরজায় মালতীদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। নীরদা আগে নামিয়া পড়িল। দুলাল গাড়ীর নিকট আসিতেই, মালতী তাহাকে গাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। অজস্র চুম্বন দিয়া সুন্দর বালকের গণ্ডদেশ রাঙ্গা করিয়া তুলিল। অতিরিক্ত আনন্দে মালতীর চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

গৃহিণী উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারা আসিয়াছেন। নীরদা উত্তরে জানাইল যে, যিনি কাল গঙ্গায় দুলালকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন।

তীব্রকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন—

"কি ঘেন্নার কথা, আমার বাড়ীতে বেশ্যামাগী, এত-বড় আস্পর্দ্ধা। খবরদার যেন বাড়ীতে না ঢোকে।"

মালতী বাহু-বন্ধন হইতে দুলালকে মুক্ত করিয়া দিয়া ডাকিল—"নীরো, গাড়ীতে উঠে আয়।"

দুলাল নামিয়া গেল, নীরদা গাড়ীর ভিতর আসিয়া বসিল। মালতী ক্ষুদ্র বালিকার মত ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া নীরদার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

বিধবা

(১)

মহা-ষষ্ঠীর দিন দ্বিপ্রহরে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে তিনটি বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল। অষ্টম-বর্ষীয়া গৌরী গৃহ-স্বামীর একমাত্র সন্তান। অপর দুইটি বালিকা লক্ষ্মী ও সাবিত্রী দুই ভগিনী,—প্রতিবেশী-কন্যা। লক্ষ্মী গৌরীর সমবয়সী, সাবিত্রী মাত্র ছয় বৎসরের।

আমরা ঠাকুর দেখ্‌তে যাবো!

কোথায় সাবিত্রী?

রায় বাবুদের বাড়ী।

চল্‌ না ভাই লক্ষ্মী, আমিও যাই।

এখনই বুঝি।

তবে কখন ?

বাড়ী গিয়ে, চুল বেঁধে, গয়না কাপড় পোরে তবে ত' ।

তবে যাই, আমিও মার কাছে গিয়ে সাজি গে ।

বালিকারা খেলা-ধূলা ছাড়িয়া, তাড়াতড়ি যে যার ঘরের দিকে চলিয়া গেল ।

অবসর সময়ে মাতা চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। গৌরী আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল ।

মা, আমি লক্ষ্মীদের সঙ্গে ঠাকুর দেখ্‌তে যাবো ।

আচ্ছা যেও ।

ভাল কোরে সাজিয়ে দাও মা আমায়, গয়না কাপড় পরিয়ে ।

মাতা চরকা ঠেলিয়া রাখিয়া, কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন ।

মা, ভাল কোরে সাজিয়ে দেবে ? ওরা কত সাজ্‌বে ।

তোমায় যে সাজ্‌তে নেই মা—বলিয়া, মাতা সজল নেত্রে কন্যাকে চুম্বন করিলেন ।

কেন মা ?

মাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—কন্যাকে জোরে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গৌরী মাতার ক্রোড়ের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল ।

(২)

পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া প্রিয় ছাত্রের নিকট শক্তি-পূজার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন :—

মহামায়ার কল্পিত মূর্ত্তি পূজা করিয়া, কেবল ভক্তিতে পূজা শেষ করিলে, পূজা সম্পূর্ণ হইবে না। চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে হইলে মহামায়ার পূজা ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল ভাবযজ্ঞে ও ভক্তিযজ্ঞে মহামায়ার উপাসনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই সম্পূর্ণ উপাসনার অভাবে শক্তি-উপাসক বঙ্গবাসী আজ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

গৌরী সম্মুখে আসিয়া বলিল—বাবা, আমায় সাজ্‌তে নেই?

না মা!

কেন বাবা?

পিতা খানিকক্ষণ কন্যার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, উত্তর দিলেন—তুমি যে বিধবা হয়েচ মা।

গৌরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ ছাত্রের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের সময় বলিয়া থাকি :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তি-রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু আমরা এই শক্তির অবমাননা করিতেছি। এই শক্তির দান প্রত্যাখ্যান করিতেছি। মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি! আমরা মনে করিতেছি যে, আমরা মা মা বলিয়া ডাকিব, আর কেবল ঘুমাইব,—আর মহাশক্তি আমাদের জন্য সব করিয়া দিবেন। কিন্তু মা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে শক্তি-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই শক্তির ব্যবহার না করিয়া, আমরা মার অবমাননা করিতেছি।

গৌরী ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল—বাবা, আমার বিধবা হোতে ভাল লাগে না!

ব্রাহ্মণ আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া—মা, নারায়ণ যে তোমাকে বিধবা করেচেন—

বলিয়াই, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ভাসিয়া গেল।

অষ্টম বর্ষ পূর্ণ না হইতেই কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের ফলে বিবাহের তিনমাসের মধ্যেই কন্যা বিধবা হইয়াছে।

পিতার বাহু-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া, গৌরী ধীরে-ধীরে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

ছাত্র সজল নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল—ধর্ম্মের কি এত কঠোর বিধি?

অধ্যাপক ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন— ধর্ম্মের নয়, সমাজের।

সমাজ-বিধির কি পরিবর্ত্তন নেই?

আছে বৈ কি, কিন্তু করে কে?

কেন, আপনারাই ত' সমাজের শিরোমণি!

আমাদের সে শক্তি কই?

তবে চিরকাল অন্যায় বিধি মেনে চল্‌তে হবে?

উপায় কি? সমাজ ত' ছেড়ে যেতে পার্‌বো না!

এ সমাজ ত্যাগ করাই ভাল।

সে ইচ্ছে, সে সাহস ত' নেই,—এই রকম করেই কাটাতে হবে।

(৩)

একখানা পরিষ্কার কাপড় পড়িয়া আসিয়া গৌরী লক্ষ্মীদের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। লক্ষ্মীর মাতা তখন লক্ষ্মীর কুন্তলে স্বর্ণ-বাঁধাই চিরুণি পরাইয়া দিতেছিলেন।

লক্ষ্মী বলিল—"এই বুঝি তোমার ঠাকুর দেখার সাজ্-গোজ্ হো'ল ?"

গৌরী উত্তর করিল—"আমায় কি সাজ্‌তে আছে, আমি যে বিধবা।"

পথের কাঁটা

আর কতদিন তোমায় ভোগাব দিদি ?

কেন বোন অমন কথা বোল্‌চ ?

বলাটা অন্যায় হয়েচে দিদি ? আচ্ছা আর ও-কথা বোল্‌ব না।

রোগিনী চুপ করিয়া চক্ষু মুদিলেন, শুশ্রূষাকারিণী ধীরে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন।

একমাস হইল একমাত্র সন্তান প্রাণাধিক-প্রিয় আদরিণী কন্যার রোগ-শান্তি কামনায় পিতামাতা মৃত্যুপথের যাত্রী সেই কন্যাকে লইয়া বৈদ্যনাথধামে আসিয়াছেন! আশা, স্বাস্থ্যকর স্থানের জল-বায়ুর গুণে কন্যা আরোগ্য লাভ করিবে। প্রথম কয়দিন কিছু উপকার দেখা

গিয়াছিল সত্য, কিন্তু ক্রমশঃই যে জীবনের আশা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, তাহা স্নেহান্ধ পিতামাতা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শুশ্রুষাকারিণী প্রাণপণে সেবা করিতেছিলেন, নিরাশ হইলেও এক একবার যেন তাঁহারও মনে হইতেছিল রক্ষা পাওয়া এখনও একবারে অসম্ভব নয়।

সংসারে অন্য কোন স্ত্রীলোক না থাকায় গৃহকর্ম্মে মাতার ক্ষণিক অনুপস্থিতিতে পাছে রোগশয্যাশায়িনী কন্যাকে সামান্য সময়ের জন্যও একা থাকিতে হয়, বা তাহার সেবার কোন ত্রুটি হয়, এজন্য একজন 'নার্স' নিযুক্ত করা হইয়াছিল। অনাত্মীয়া অর্থগ্রাহী সেবিকা যে এরূপ ভাবে প্রাণ দিয়া সেবা করিতে পারে পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বাবুর এধারণা ছিল না। অমিয়া যেরূপ প্রাণ দিয়া রেখার সেবা করিতেছিল, তাহাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে আশা জন্মিয়াছিল যে, সেবার গুণেই কন্যা আরোগ্য লাভ করিবে।

দিদি—

কি বোন?

একমাস হয়ে গেল, তিনি ত কৈ একবারও এলেন না?

বোধ হয় কাজের বড় ভিড় পড়েচে, একটু সময় পেলেই এসে পড়বেন।

পথের কাঁটা

আসবার দিন আমায় কিন্তু বলেছিলেন—তোমরা যাও, আমি নিশ্চয়ই এক সপ্তাহ পরে গিয়ে একবার দেখে আস্‌বো।

তখন তাই মনে করেছিলেন হয় ত, কিন্তু ডাক্তারের কাজের কথা ত কিছু বলা যায় না।

না দিদি, তিনি হয় ত আস্‌বেন না। আমায় তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্যে তখন ঐ বলে বুঝিয়েছিলেন।

ছিঃ বোন, ও-কথা মনে করতে নেই। আস্‌বেন বৈ কি, নিশ্চয়ই আস্‌বেন।

রেখা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি তুমি বুঝি জান না, আমার আর একবার বিয়ে হয়েছিল।

অমিয়া একবার রেখার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কথাগুলা যেন তাহার কাছে অসংলগ্ন বোধ হইতে লাগিল।

তুমি মনে করেচো বুঝি আমি ভুল বল্‌চি, ভুল বলিনি দিদি—শুন্‌বে? তোমাকে সব বল্‌লে আমার মনটা অনেকটা হাল্কা হবে।

* * * *

আমার যখন তের বছর বয়েস, তখন আমার প্রথমবার বিয়ে হয়। আমি তখন থার্ড ক্লাসে পড়তুম। বাবার বরাবর ইচ্ছে ছিল

যে, অন্ততঃ ষোল বছর বয়েস না হ'লে আমার বিয়ে দেবেন না। কিন্তু কি জানি তাঁকে দেখেই কি-রকম ভাল লাগে, আর মত বদ্‌লে ফেলেন। তিনি তখন সবে বি-এ পাশ করে এম-এ আর ল ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েচেন, বয়েস একুশ বাইশ বছর। তাঁদের বাড়ী রাণাঘাটের কাছে, তিনি কলকাতায় হোষ্টেলে থেকে পড়তেন।

বিয়ের পর বাবা হোষ্টেল থেকে তাঁকে আমাদের বাড়ীতে আনলেন। তাঁর আর হোষ্টেলে থাকা হবে না, এখানে থেকেই লেখাপড়া করবেন। দিনকতক পরে বাবা তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন—বিনয়, রেখাকে আবার স্কুলে পাঠাতে তোমার অমত নেই ত? তিনি জানালেন যে, তাঁর কোনই অমত নেই। বরং তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবারই খুব পক্ষপাতী।

তাঁর কাছেই স্কুলের পড়া করতুম। লেখাপড়া আমোদ-প্রমোদে দিন কাট্‌ত। আমি তখন বড় চঞ্চল ছিলুম। কিন্তু তিনি ছিলেন ঠিক আমার উল্টো, অতি ধীর প্রকৃতির। এক এক সময় আমার চঞ্চলতার জন্যে তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বকৃতেন। কিন্তু তখনই আবার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে কত আদর করতেন। বল্‌তেন—একটু বয়েস হলেই ও-সব সেরে যাবে।

বিয়ের পরেও মাথায় কাপড় দিতুম না। আগেকার বেশেই

স্কুলে যেতুম। স্কুলের মেয়েরা অনেকে আমায় অনেক রকম ঠাট্টা কোর্‌ত। কেউ বোল্‌ত—বিয়ে হয়েচে ত মাথায় ঘোমটা দাও, তা না হলে তোমার শ্বাশুড়ী বড্ড রাগ করবেন। কেউ বোল্‌ত—তোমায় ভাই বিয়ে হওয়া মেয়ে বলে মোটেই মানায় না। যারা জান্‌ত যে আমি স্বামীর কাছে স্কুলের পড়া করি, তারা বোল্‌ত—তোমার মাষ্টারটী ভাই বেশ। কিন্তু ও-রকম মাষ্টারের কাছে পড়লে পাশ হওয়ার আশা কম। তাঁর কাছে একদিন মেয়েদের ঠাট্টার কথা বলাতে তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—ওদের সকলের বিয়ের লোভ আছে বলেই ঐ সব ঠাট্টা করে। আমি মেয়েদের কাছে তাঁর এই উত্তরটা জানাতে তারা খুব হেসেছিল। ক্লাসের মধ্যে বীণা বলে একটী মেয়ের সঙ্গে আমার সব চেয়ে বেশী বন্ধুত্ব ছিল; সে কিন্তু সেই দিনই আমায় চুপি চুপি জানিয়েছিল, সত্যি সত্যি তার লোভ হয় আমায় দেখে। তারও ইচ্ছে হয় যে, তার বিয়ে হয়ে যায়, আর সে তার স্বামীর কাছ থেকে আমারই মতন স্কুলের পড়া তৈরী করে আসে। স্কুল থেকে গিয়ে তাঁকে একথা জানিয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন—দেখ্‌লে ত আমি যা বলেছিলুম সত্যি কি না, যে কজন মেয়ে তোমায় কেবল ঠাট্টা করে তাদের সকলেরই ঐ এক ইচ্ছে।

এক বছর কেটে গেল। তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়্‌চি।

গ্রীষ্মের ছুটিতে, বিয়ের পর প্রথম শ্বশুর-বাড়ী গেলুম। শাশুড়ী খুব আদর কোরে ঘরে তুলে নিলেন। আমাকে পেয়ে তাঁর যে কি আনন্দ তা বোলে বোঝাতে পারি না। আমি সহরের মেয়ে, প্রথম পাড়াগাঁয়ে ঘর করতে গেচি, আমার যাতে কোন রকম কষ্ট না হয় তিনি সকল সময় সে ভাবনাতেই ব্যস্ত থাকতেন। আমার কিন্তু পাড়াগাঁ এত ভাল লাগতো কি বোল্‌ব। প্রায়ই এক এক বাড়ীতে আমাদের দুজনের নেমতন্ন থাকৃত, সকলেই আমাকে খুব আদর যত্ন করতেন। যে বাড়ীতেই যেতুম সেখানেই তাঁর অজস্র সুখ্যাতি শুনতুম। আমি না কি খুবই ভাগ্যবতী, তাই ও-রকম স্বামীর হাতে পড়েচি—এ কথাও অনেকে বলতেন। এ সব শুনে আমার মনে একটু গর্ব্ব বোধ হো'ত। গ্রীষ্মের ছুটির দু মাস যে কি আনন্দে কাট্‌ল, তা কি বোল্‌ব। শাশুড়ীকে কাঁদিয়ে, নিজে কেঁদে যে দিন কলকাতায় চলে আসি সে দিন খুবই কষ্ট হয়েছিল।

আরও পাঁচ ছ মাস কেটে গেল। তাঁকে আগে কেবল ভালই বাসতুম, ক্রমে ভক্তি করতে শিখলুম। চঞ্চল স্বভাব যে কি কোরে ধীর হোয়ে এল, তা নিজেই বুঝতে পারলুম না। পড়াশুনো যতটা পারি নিজেই করতুম, যখন তখন আর তাঁকে জ্বালাতন করতে ইচ্ছে হোত না। সেকেণ্ড ক্লাস থেকে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলুম। পরীক্ষার

ফল তত ভাল হয়নি বলে তিনি দুঃখিত হলেন। ক'মাস পরেই তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ হবে। পরীক্ষা হয়ে গেলে তিনি আমাকে পড়ানর জন্যে বেশী সময় দিতে পারবেন, তাহলে আসছে বছর আমি ভাল করে পাশ করতে পারবো, জানিয়ে, তাঁকে আশ্বস্ত করলুম।

পরীক্ষার পরেই তিনি অসুখে পড়লেন। ডাক্তার বললেন, স্বাস্থ্যের যত্ন না নিয়ে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করেই অসুখটা ঘটেচে। দশ বার দিনের মধ্যেই অসুখ খুব বেড়ে গেল, বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমার শাশুড়ীকে আনান হো'ল। সকলে মিলে রোগীর সেবার ভার নিলেন। যখন খুব বাড়াবাড়ি তখন আমাকে একবার একা পেয়ে বললেন—রেখা, আমি চললুম। তুমি আবার বিয়ে কোরে সুখী হ'য়ো। তার দুদিন পরেই সকলের প্রাণপণ সেবা অগ্রাহ্য কোরে তিনি চিরকালের মত চলে গেলেন।

পনের বছর বয়েসে একমাত্র আদরের মেয়ে বিধবা হওয়ায়, মা-বাবা যেন পাগলের মত হয়ে গেলেন। আমি যে কি রকম হয়ে গেলুম, তা নিজেই বুঝতে পারলুম না। গত দু বছরের ঘটনা সব যেন স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। বাইরে এমন কোন ভাব প্রকাশ করতুম না, যাতে মা-বাবার মনে কষ্ট বাড়ে। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। ঘর-সংসারের কাজে মার একটু-আধটু সাহায্য করতুম।

ইচ্ছে হলে কখন বা লেখাপড়ায়ও মন দিতুম। কিন্তু কিছুতেই যেন শান্তি পেতুম না। এক একবার মনে হোত, হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য যা তাই করি, আমার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করে দিন কাটাই। আবার মা-বাবার কথা মনে হয়ে সে ইচ্ছে চলে যেত।

একটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শুনলুম, বাবা আমার আবার বিয়ে দেবেন। মা-ও রাজি হয়েচেন, কেবল আমার মত হলেই হয়। মনে যে কত রকম ভাবনা উঠ্‌ল কি বোল্‌ব। আমি মত দিলুম। তিনি যে আমাকে বিয়ে কোরে সুখী হোতে বলে গেছেন! মনের গোপন কোণে বিয়ের জন্যে একটু আগ্রহও জাগ্‌ল।

যে বিলেত-ফেরত ডাক্তার শেষ সময়ে তাঁকে চিকিৎসা কোরেছিলেন, তিনিই আমাকে বিয়ে কোরতে রাজি হয়েচেন। এ বিধবা-বিয়েতে তাঁর বাড়ীর সকলেরই মত আছে। ডাক্তারবাবুর বয়েস বত্রিশ তেত্রিশ হলেও, এতদিন মনোমত পাত্রী না পাওয়ায় তিনি বিয়ে করেন নি। আমায় নাকি তাঁর খুবই পছন্দ হয়েচে।

ষোল বছর বয়েসে আমার আবার বিয়ে হো'ল। বাবার ত গোড়া থেকে তাই ইচ্ছে ছিল, মধ্যে থেকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে সকলে অশান্তি ভোগ করলে। বাবা বল্‌লেন—তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতার

দোষেই যত গোল ঘটেছিল। বিয়েতে অনেক বড় বড় লোক এসে উৎসাহ দিলেন। বিধবা বিবাহ করে ডাক্তারবাবু নাকি খুব সৎসাহস দেখালেন। অনেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌ল। খবরের কাগজেও তাঁর প্রশংসা বেরুল।

বিয়ের কদিন কিছু বুঝতে পারিনি। একমাস পরেই শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর করতে এলুম। এসে জানতে পারলুম, বিধবা বিয়েতে বাড়ীব কারও মত ছিল না, শাশুড়ী নাকি খুবই অমত প্রকাশ করেছিলেন! কেবল ছেলের জেদের জন্যেই শেষে বাধা দেন নি। উপায়ী ছেলের কথা মাকে মেনে নিতেও হয়েছিল। বেশ বুঝতুম, বাইরে প্রকাশ না করলেও সকলে যেন আমায় একটু ঘৃণার চোখে দেখচে। কিন্তু একজনের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদর ও ভালবাসা পেয়ে একরকম আনন্দেই দিন কাটত। ইচ্ছে মত দু-একদিন কোরে মার কাছ থেকে আসতুম। মা-বাবার খুব আনন্দ যে আমি সুখী হয়েছি।

এক বছর পরে বেশী দিনের জন্যে মার কাছে থাকতে এলুম। মার খুব আনন্দ হো'ল। আমি যে মা হতে চলেচি, আর তিন মাস পরেই তাঁর প্রথম নাতি জন্মাবে—এ যে আনন্দ হবারই কথা। আমার আদর যেন আরও বেড়ে গেল। মনে মনে বেশ আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করতুম।

নবীন অতিথি এলো। মা-বাবার আর আনন্দ ধরে না, এমন আনন্দ কোর্‌তে তাঁদের আর কখনও দেখিনি। কচি মুখখানি কি সুন্দর, সকলে বললেন আমারই মতন দেখতে হয়েচে। কদিন পরে ডাক্তারবাবু এসে একদিন দেখে গেলেন। তাঁর মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখলুম, দেখে আমার আনন্দ যেন আরও বেড়ে গেল। আমার শাশুড়ী কিন্তু একদিনও নাতি দেখ্‌তে এলেন না, মার সে জন্যে মনে কষ্ট হো'ল।

আরও ছমাস মার কাছে কাটালুম। এই ক-মাসের মধ্যে খোকা যেন আমার সমস্ত বুকটা জুড়ে বস্‌ল। তাকে আদর করতে, আর তার কাজ-কর্ম্ম করতেই সমস্ত সময়টা কেটে যেত। শ্বশুর-বাড়ী যাবার দিন মা অনেক কষ্টে আমাদের বিদেয় দিলেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগ্‌ল।

ন-মাস পরে আবার শ্বশুরবাড়ী এলুম। খোকাকে পেয়ে আমার ওপর বাড়ীর সকলের ভালবাসা বেড়ে গেল। শাশুড়ীর কিন্তু আমার ওপর ঘৃণা যেন একটুও কম্‌ল না। খোকাকে তিনি সে রকম কোরে আদর করতেন না বলে আমার মনে বড় কষ্ট হোত। স্বামীর ভালবাসাও যেন একটু কমেচে বলে মনে হোতে লাগ্‌ল, কিন্তু সেটা নিজের ভুল কি না ঠিক বুঝতে পারতুম না। খোকাকে নিয়েই আনন্দে দিন কাটাতুম।

ঠাকুরমার কাছে খোকার অনাদর আমার ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। একদিন ডাক্তারবাবুকে এ কথা বল্‌লুম। যা উত্তর পেলুম তা যেন এখনও আমার মনে বিঁধে রয়েচে। তিনি বল্‌লেন—তোমায় বিয়ে কোরে আমি বড় ভুল করেচি। মুখে ভাল বল্‌লেও বিধবা বিয়ে এখনও আমাদের সমাজে চলে নি। সমাজের কাছে আমাদের একটু হীন হতে হয়েচে। মার কিছু দোষ নেই, খোকারই ভাগ্যের দোষ, তাই ঠাকুরমার আদর পাচ্চে না। আমরা না হয় এক রকম কাটিয়ে যাব, কিন্তু বিধবা-বিয়ের সন্তান বলে ওকে যে চিরকাল সমাজের চোখে হেয় হয়ে থাক্‌তে হবে! কথাগুলো যেন তীরের মতন এসে বুকে বিঁধ্‌লো। খোকাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে কতক্ষণ যে কাঁদলুম মনে নেই। যখন কান্না থাম্‌ল, দেখলুম ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেছেন।

রাত্রে ডাক্তারবাবু খুব আদর করলেন। কথাগুলো বলার জন্যে আমি যেন মনে আর কষ্ট না করি। তাঁর মনের ভেতর যেগুলো জমে ছিল হঠাৎ বেরিয়ে পড়েচে। তিনি অনেকদিন চেপে রেখে আর চাপ্‌তে পারেন নি। আমার ওপর তাঁর ভালবাসা একটুও কমেনি। আরও কত কি বলেছিলেন মনে নেই, কিন্তু আমার মনের ঘা একটুও কম্‌ল না।

মানস-কমল

এতদিন পরে আবার একজনের কথা বড় বেশী কোরে মনে পড়তে লাগল। তিনি যে আমায় সুখী হবার জন্যে আবার বিয়ে করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমার বরাতে সুখ নেই দেখচি। যদি আবার বিয়ে না করতুম তাহলে ত এমন ঘা খেতে হোত না।

মনের অসুখে শরীর কখনও কি ভাল থাকে। মনের সঙ্গে শরীরও ভেঙ্গে পড়ল। স্বামী ডাক্তার, চিকিৎসার ক্রটি গেল না, কিন্তু তিন মাস ভুগে শরীর একেবারে অর্দ্ধেক হয়ে গেল। শাশুড়ী বল্লেন,—বৌমার অসুখ ত এখানে সারচে না, মার কাছে পাঠিয়ে দাও, সেখান থেকেই চিকিৎসা হোক। স্বামীও মত দিলেন। মার কাছে চলে এলুম।

একমাস ধরে মা-বাবার প্রাণপণ সেবায় আমার রোগ একটুও কমাতে পারলে না। ডাক্তারেরা বল্লেন, ভাল জায়গায় নিয়ে গেলে সারতে পারে। তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমরা এখানে এলুম। এখন তোমারই সেবা নিচ্চি দিদি। আর বোধ হয় বেশীদিন নিতে হবে না। মা-বাবার কোলে খোকাকে দিয়ে যাচ্চি, ওঁরা ত প্রাণপণ যত্নেই খোকাকে মানুষ করবেন। ওঁদের ত ও-ছাড়া আর কোন অবলম্বন রইল না। একটা কথা কেবল মনে হচ্চে, বড় হয়ে ও যখন সমাজের চোখে নিজেকে হেয় বোধ করবে, তখন ও কাকে দোষ দেবে দিদি?

আমাকেই দোষ দেবে নয়?—আমি কেন বিধবা হ'য়ে আবার বিয়ে করেছিলুম।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

রোগিণী চুপ করিল। শুশ্রূষাকারিণীর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। তিনি যেমন নীরবে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, সেইরূপই বাতাস করিতে লাগিলেন।

রাত দুপুরে

রাত্রি দ্বিপ্রহর। নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে অল্পক্ষণ হইল শয়ন করিয়াছেন। স্বামীর নিদ্রা আগত-প্রায়। স্ত্রীর নিদ্রা আসিতেছে না, মনে নানা বিভিন্ন চিন্তার উদয় হইতেছে। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

তোমাদের পুরুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই।

স্বামীর আগত-প্রায় নিদ্রা দূরে চলিয়া গেল, বলিলেন—ঠিক বলেচ, বেশী বিশ্বাস কোরে কারও সঙ্গে মিশো না যেন।

যাও, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। আমি কি তাই বল্‌চি নাকি!

তবে কি বোল্‌চ?

রাত দুপুরে

বোল্‌চি তোমার প্রিয় বন্ধুর কথা!

বন্ধু আবার কি করলে ?

করবে আবার কি, বউ মরবার ছ-মাসের মধ্যেই বিয়ে!

তা সকলে ধরে-বেঁধে দিলে।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ জানি, পুরুষ জাতটাই ঐ।

রাত দুপুরে হঠাৎ পুরুষ জাতের ওপর এত রাগ হো'ল কেন ?

বউ মারা যেতে কি শোকের ঘটা!

তা প্রমোদ শোকটা খুব পেয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সন্দেহ থাক্‌বে কেন ? বউএর চেহারা দিয়ে যখন আবার শোকগাথা ছাপিয়েচে।

শোকগাথা ছাপিয়ে কি বড্ড অন্যায় করেচে ?

অন্যায় নয়ত কি ? ছমাস না যেতেই যে বিয়ে করতে পারলে, তার আবার অত বাড়াবাড়ি কেন ?

লীলাকে যে খুব ভালবাসতো সেটা ত মিথ্যে নয়!

মিথ্যে নয়ত কি ? তা না হলে এর মধ্যেই আবার বিয়ে!

লীলা ত তোমার কাছেই কতবার বলেচে, এ রকম ভালবাসা একেবারে দুর্লভ।

বলে ত ছিলই। আমিও তখন মনে করতুম সত্যি।

আর এখন একেবারে সব মিথ্যে হয়ে গেল ?

মিথ্যে—একেবারে মিথ্যে। সাধে আর বলি পুরুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই।

কিন্তু শাস্ত্রে কি বলে জান ?

কি আবার বলে ?

বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু—

ও পুরুষের শাস্তর, তাই স্ত্রীষু করেচে ; আমরা হলে পুরুষেষু করে দিতুম।

আচ্ছা এইবার থেকে আমায় আর বিশ্বাস কোর না। (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ)

বাঃ আমি কি তোমায় বল্‌চি। (আলিঙ্গনে বন্ধন)

(যেন অল্প রাগত ভাবে) না আমায় কেন, আমি যেন পুরুষজাত ছাড়া।

(অতি নরম সুরে) সত্যি তোমাকে কিছু বলিনি, রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।

(হাসিয়া) খুব রাগ করেচি, তার শাস্তি এই—

ভারী দুষ্টু ! আচ্ছা, আমি এত কোরে বলি তোমার রাগ হয় না ?

খুব রাগ হয়।

না—সত্যি কোরে বল না ?

না গো না একটুও রাগ হয় না।

আচ্ছা আমি যদি এখন মরে যাই ?

তা হলে কালই আর একটা বিয়ে করি।

সত্যি কি কর বল না ?

ঐ ত বল্‌লুম।

বাজে কথা। তোমার খুব কষ্ট হয় নয় ?

তা হয় বোধ হয়।

আমি কিন্তু এখন মরতে পারবো না।

কে বল্‌চে তোমায় ?

এত সুখের ভেতর কেউ কি মরতে চায় ?

স্বামী দেখিলেন, কথা ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে, অথচ আর জাগিয়া থাকিতেও ভাল লাগিতেছে না। অগত্যা তাঁহাকে কথা বন্ধ করার পরীক্ষিত উপায়টা প্রয়োগ করিতে হইল। বলিলেন—

আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই ?

যাও, আবার ঐ কথা !

স্ত্রী অভিমান করিয়া অন্য দিকে ফিরিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত স্বামীর নাসিকা গর্জ্জন তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল।

জাতের গরব

(১)

সুন্দরগড়ের লোকে প্রথমে যখন শুনিল যে, পরলোকগত সরকারী উকিল হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ, মিসন হাঁসপাতালের খৃষ্টান ডাক্তার জন রামধন বিশ্বাসের কন্যা মেরি সুশীলা বিশ্বাসকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে, তখন সে কথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয় বিশেষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। পশ্চিমের এই ক্ষুদ্র সহরের সকল লোকেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিত। সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সুন্দরগড়বাসীরা কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। পিতার ধর্ম্মভাব পুত্রেও যথেষ্ট প্রকাশ

পাইত। ধর্ম্মসভার কার্য্যে বিমলেরও বিশেষ উৎসাহ ছিল। ডাক্তার হইয়া আসিলেও কেহ তাহাকে কখনও কোন অনাচার করিতে দেখে নাই। বিমল যে খৃষ্টানের কন্যা বিবাহ করিতে পাবে, ইহা সকলেরই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

মিসন হাঁসপাতালের ডাক্তার বিশ্বাস মহাশয় হরিনাথবাবুর আগমনের কিছুকাল পূর্ব্বে সুন্দরগড়ে আসিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় মিসন হাঁসপাতালে কার্য্য করিয়া বাকি সময় বাহিরে চিকিৎসা ব্যবসায় করার অধিকার তাঁহার ছিল। নিজের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে তিনি একজন বিশেষ সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারের দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বর্ত্তমানে এই সহরে যে ইংরাজী স্কুলটী রহিয়াছে, ডাক্তার বিশ্বাসই ইহার মূল। হরিনাথবাবুও স্কুলটীর জন্য অনেক করিয়াছিলেন। গোঁড়া হিন্দু হইলেও হরিনাথবাবুর ডাক্তার বিশ্বাসের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। চিকিৎসার সময় তিনি ডাক্তার বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। ডাক্তার বিশ্বাসের পরামর্শেই তিনি একমাত্র পুত্রকে ডাক্তারী পড়িবার জন্য কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

ডাক্তার বিশ্বাস; একজন খাঁটী খৃষ্টভক্ত ছিলেন। মিসনের

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতেন। একমাত্র সন্তান 'মেরি'কে সুশিক্ষিতা করার আশায় তিনি কলিকাতায় বেথুন কলেজে রাখিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন। গত বর্ষে অকস্মাৎ তাঁহার সাধ্বী পত্নীর মৃত্যু ঘটায় কন্যাকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন। সুশীলা মিসন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে।

পিতার মৃত্যুর পর বিমল যখন মাতাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যায়, তখন সুশীলাকে মাত্র একাদশ বর্ষীয়া বালিকা দেখিয়া গিয়াছিল। ডাক্তারী পাশ করিয়া আসিয়া পাঁচ বৎসর পরে সুশীলাকে যখন দেখিল, তখন সে ষোড়শী যুবতী। তাহার রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর সেবার কিছু বেশীদিন সুশীলা বাড়ীতে থাকিতে পাইয়াছিল। সেই সময়ে উভয়ের অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তখন হইতেই উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। মধ্যের এক বৎসর, অধিকবার আর কেহ কাহাকেও দেখিবার সুযোগ পায় নাই। মাতার মৃত্যুর পর সুশীলা কলেজ ছাড়িয়া আসিয়া গত একবৎসর সুন্দরগড়ে রহিয়াছে, একদিনের জন্যও অন্য কোথাও যায় নাই। এই সময়ের মধ্যেই উভয়ে উভয়ের প্রতি একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

জাতের গরব

মাতা পুত্রের সঙ্কল্প শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার পুত্রের মত সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম পাত্রের জন্য হিন্দুসমাজের কত সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যার পিতা আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন, কেবল পুত্রের বিশেষ অমতের জন্যই তিনি কোথাও কথা দিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে পুত্রের এই সাতাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি তাহার বিবাহ না দিয়া কখনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন না। তাঁহার পুত্র যে শেষে খৃষ্টান হইয়া যাইবে, ইহা তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। মাতার অনুরোধ, উপরোধ, ক্রন্দন কিছুতেই বিমলের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। সে শুধু একটীমাত্র কথা মাতাকে জানাইয়া দিল যে, সুশীলাকে বিবাহ করিতে না পারিলে, সে জীবনে আর কখনও বিবাহ করিবে না। স্নেহান্ধ মাতা শেষে পুত্রকে বিবাহ করিতে মত দিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহাকে কলিকাতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। বিমল মাতাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, সে নিজে কখনই খৃষ্টান হইবে না, আর্য্য-সমাজী মতে—এক রকম হিন্দুমতেই—বিবাহ করিবে। মাতা কিন্তু পুত্রের এ কথা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হিন্দুর ছেলে খৃষ্টানের মেয়ে বিবাহ করিয়াও যে কিরূপে হিন্দুত্ব বজায় রাখিবে, তাহা তিনি ধারণায়ও আনিতে পারিলেন না।

৫

সুশীলা মাতার নিকট হইতে স্ত্রীজন-সুলভ সকল সদ্‌গুণ লাভ করিয়া খৃষ্টে অসীম ভক্তি এবং চিত্তের দৃঢ়তা পিতার এই দুইটী বিশেষ গুণও লাভ করিয়াছিল। বিমল যখন আর্য্য-সমাজী মতে বিবাহের প্রস্তাব করিল, সুশীলা তাহাতে বিশেষ অসম্মতি জানাইল! সে সমস্ত হৃদয় দান করিলেও ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহিল না। বিমল নিজে যে খৃষ্টান মতে বিবাহের বিপক্ষে, এ কথা সুশীলাকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিল। দুজনের অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইল। সুশীলা তর্কে বলিল, খৃষ্টানধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ধর্ম্ম! খৃষ্টান জাতিই সকল জাতিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি। জ্ঞানে, সম্পদে ও বলে খৃষ্টান জাতিই জগতের অন্য জাতির অপেক্ষা বলীয়ান। খৃষ্টান জাতির নিকটই অন্য সকল জাতি মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। বিমল বলিল, সনাতন হিন্দুধর্ম্মই ভারতের প্রাণের ধর্ম্ম। অন্য বিদেশী ধর্ম্মের সহিত ভারতবাসীর কখনও প্রাণের যোগ হইতে পারে না এবং তাহা পারাও একেবারে অসম্ভব। হিন্দুধর্ম্ম যে, সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা কোন প্রকারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তর্কের শেষে এই স্থির হইল যে, 'তিন আইন' অনুসারে রেজেষ্টারী করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইবে। কাহাকেও নিজের ধর্ম্মমত, স্বজাতির গৌরব একটুও ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে না।

অষ্টাদশবর্ষীয়া শিক্ষিতা যুবতী কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ

করিতে ডাক্তার বিশ্বাসের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ বিমলের মত সুপাত্রের গলে মাল্য অর্পণ করিলে, তাঁহার একমাত্র সন্তান আদরিণী 'মেরি'র দাম্পত্য-জীবন যে অতি সুখেরই হইবে সে বিষয়ে তিনি স্থির-নিশ্চয় ছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে বিমলকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লওয়া তাঁহার মানসিক বাসনা ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে বিমলের সম্পূর্ণ অমত দেখিয়া তিনি আর কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বিশেষ আঘাত লাগিলেও, কন্যার সুখের জন্য তিনি বাধা না দেওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য মনে করিয়াছিলেন।

(২)

রেজেষ্টারী করিয়া যথাসময়ে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুশীলা এখন স্বামীগৃহে। অতি আনন্দেই তাহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে। উভয়েই মনে করিতেছে, তাহাদের মত সুখী দম্পতি সংসারে আর নাই। একটি বিষয়ে মাত্র তাহাদের যে অমিল আছে, তাহার জন্য স্বামী স্ত্রী কাহারও কোন অসুবিধা নাই। উভয়েই নিজের জাতির গর্ব্বকে অতিরিক্তভাবে আঁকড়াইয়া আছে। প্রত্যেকেই সুবিধা পাইলে অপরকে নানাদিক দিয়া জানাইয়া দিতে চায় যে, তাহার জাতিই, তাহার ধর্ম্মই, জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি ও ধর্ম্ম। প্রতি রবিবার প্রাতে সুশীলা যখন গির্জ্জায় যাইত, বিমলও সেই সময়ে ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইত। পূর্ব্বে কার্য্যের দোহাই দিয়া মাঝে মাঝে ধর্ম্মসভায় অনুপস্থিত থাকিলেও, বিবাহের পর হইতে বিমল এক রবিবারও সভায়

যাওয়া বাদ দেয় নাই। সুশীলা সুবিধা পাইলেই স্বামীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান্ করিয়া শুনাইত। বিমল নিজে গাহিতে না জানিলেও বন্ধুবান্ধবদের ধরিয়া আনিয়া বাড়ীতে নানাপ্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত গান করাইত। এক একদিন রীতিমত কীর্ত্তনও হইত। শয়নগৃহে একই দেওয়ালে সংস্কৃত ওঁ লেখার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি এবং ক্রুসে বিদ্ধ খৃষ্টমূর্ত্তি পাশাপাশি ঝুলান দেখিয়া, বন্ধুবান্ধবেরা তাহাদের উভয়কে নানা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না।

বিমলের মাতা কলিকাতা হইতে পত্রদ্বারা নিয়মিত পুত্র ও পুত্র-বধূর সংবাদ লইতেন, তাহারা উভয়েও পত্রোত্তর দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিত। তাহারই কারণে মাতা পুত্রকে ছাড়িয়া দূরে বাস করিতেছেন, একথা মনে করিয়া সুশীলা অনেক সময় বেদনা অনুভব করিত। সে যে মাতৃহীনা, শ্বাশুড়ীর স্নেহ লাভের জন্য তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আকাঙ্ক্ষা জাগিত। সাবধানে স্বামীর নিকট একবার মাত্র শ্বাশুড়ীর আসার কথা উত্থাপন করিয়া সুশীলা শুনিয়াছিল যে, তাহার আশা দুরাশা মাত্র, তিনি কখনই খৃষ্টান পুত্রবধূর সংসারে আসিবেন না। তাঁহাকে লইয়া আসার চেষ্টা করা একবারেই বৃথা।

এক বৎসর পরে পিত্রালয়ে সুশীলার একটি পুত্র জন্মিল। ইহার পরেই সুশীলা বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িল। প্রায় চার মাস

ধরিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। একজন ধাত্রী শিশুকে পালন করিতে লাগিল। রোগশয্যায় শুইয়া সুশীলা পুত্রের সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বিভোর হইয়া থাকিত। অন্তরের আনন্দই অনেক সময় তাহার বাহিরের রোগ যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিত। মাতৃত্বে যে এতটা সুখ, তাহা তাহার ধারণাই ছিল না। বিমল তাহাকে দেখিতে আসিলে, সুশীলা নিজের রোগের কথা অপেক্ষা খোকার কথাই অধিক বলিত। তাহার মনে হইত, এতদিন পরে সে যেন স্বামীকে আরও ভাল করিয়া জানিয়াছে, ভাল করিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছে।

প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র সন্তান বিমলের প্রথম পুত্রকে তিনি এখনও যে চক্ষে দেখিতে পান নাই, এজন্য বিমলের মাতা অন্তরে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেন। কতবার তাঁহার মনে হইত, ছুটিয়া গিয়া একবার পৌত্রকে দেখিয়া আসেন। কিন্তু খৃষ্টান-সংসারে প্রবেশ করা তাঁহার মত হিন্দু বিধবার যে একেবারে অকর্ত্তব্য, এ কথা মনে হইলেই তাঁহার সঙ্কল্প কোথায় বিলীন হইয়া যাইত।

(৩)

রোগ আরোগ্যের পর নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া সুশীলা সপুত্র আজ নিজ আলয়ে আসিয়াছে। তাহার রূপ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। খোকা এখন প্রায় ছয় মাসের। পিতার মত মুখাকৃতি ও মাতার মত রূপ তাহাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। বিমলের আজ আনন্দ আর ধরে না। তাহাদের ভবন আনন্দপুরীতে পরিণত হইয়াছে।

পরদিন রবিবার। খোকাকে ফেলিয়া সুশীলার আর গির্জ্জায় যাওয়া হইল না, বিমলও অনেক দিন পরে আজ ধর্ম্মসভায় অনুপস্থিত হইল। গির্জ্জার পরে ডাক্তার বিশ্বাস কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া সম্মুখের বারাণ্ডায় খোকাকে লইয়া বসিলে, কেবল খোকার কথাই চলিতে লাগিল। কবে খোকার ব্যাপ্‌টিজম্‌ হইবে ও তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, সুশীলা পিতার সহিত সেই

কথার আলোচনা করিতেছিল। খোকা দাদামহাশয়ের ক্রোড়ে বসিয়া, তাঁহারই প্রদত্ত সোণার হারে সংলগ্ন মুক্তা খচিত ক্রুসটা মুখে পুরিবার চেষ্টা করিতেছিল। বিমল চুপ করিয়া একদৃষ্টে খোকার দিকে চাহিয়াছিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে বলে, বন্ধুবান্ধবরা খোকার অন্নপ্রাশনের জন্য ধরিয়াছে, কিন্তু চুপ করিয়াই গেল।

বাড়ীর দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে, সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে পড়িল। গাড়ীর ভিতর হইতে মাতাকে নামিতে দেখিয়া, বিমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। মাতা পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। সুশীলা ও ডাক্তার বিশ্বাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাতা পুত্রের এই অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে লাগিলেন। মাতা বারাণ্ডার সিঁড়িতে পা দিয়াই আবেগভরা কণ্ঠে বলিলেন—"কই আমার দাদা কই।" বিশ্বাস মহাশয় খোকাকে মেঝেয় বসাইয়া দিতেই, তিনি তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অসংখ্য চুম্বনে ভরিয়া দিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে দৃশ্যে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সুশীলা প্রস্তর-মূর্ত্তির মত এক ধারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। "বৌমা"—শ্বাশুড়ীর এই স্নেহভরা ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মাতা পুত্রবধূকে জড়াইয়া ধরিলেন।

(৪)

মন্ত্রশক্তিতে যেন সুশীলার সমস্ত জাতের গর্ব্ব টুটিয়া গিয়াছে। রাত্রে নিজের শয্যায় স্বামীর অপেক্ষায় সে বসিয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে খোকা নিদ্রিত। কোমল কণ্ঠে ক্রুসের সঙ্গেই ঠাকুরমার সদ্যপ্রদত্ত স্বর্ণের অক্ষয় কবচ শোভা পাইতেছে। মুখে কি স্বর্গীয় হাসি। সুশীলা একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। বিমল ঘরে আসিলে উভয়ে শয়ন করিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর সুশীলা বলিল—"মা বল্‌ছিলেন, খোকার ঘটা করে ভাত দেওয়া হবে, তাই হোক!" বিমল উত্তর করিল,—"বল্‌ছিলেন বটে!" একটা ব্যবধান যে উভয়ের মাঝে রহিয়া গিয়াছে, আজই সুশীলা তাহা প্রথম তীব্র বেদনার মত অনুভব করিল। এ ব্যবধান সে ত আর একদিনও সহ্য করিতে পারিবে না। হঠাৎ আবেগভরে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আমায় আর্য্যসমাজী মতে হিন্দু করে নাও!" বিমল ধীরে ধীরে তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া বলিল—"তাতে আর কোন লাভ নেই, হিন্দুসমাজ ত আমাদের স্থান দেবে না। আমাকেই খৃষ্টান সমাজে যেতে হবে।"

জয়-পরাজয়

(১)

সীমান্তে শত্রু-দমনের জন্য রাণা স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার জয়-কামনায় রাণী প্রত্যহ বিজয়-ভৈরবের মন্দিরে পূজা দিতেছেন। তিন সপ্তাহের অধিক কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতেছে ; এখনও পার্ব্বত্য-সর্দ্দার রাণার নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই। বিরহ, ভাবনা ও ভয়ে রাণী মলিন হইয়া রহিয়াছেন। প্রধানা সহচরী মাধবী তাঁহার মলিনতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আর দু একদিনের মধ্যেই সর্দ্দারকে হার মান্‌তে হবে।

তাই যেন হয় মাধবী। আমার ত ভাবনার অন্ত নেই।

বাবা বিজয়-ভৈরব সহায়, তখন আবার ভাবনা কি।

বাবাই ত আমাদের একমাত্র ভরসা মাধবী।

আচ্ছা, রাণা কি সেখানে এমনি কোরে তোমার কথা দিনরাত ভাবচেন ?

নিশ্চয়ই, তাঁর মন কি আমায় ছেড়ে থাকতে পারে।

তা ঠিকই, এমন স্বামীলাভ ভাগ্যের কথা।

আমিও তাই ভাবি মাধবী, যে আমার কি সৌভাগ্য !

আর ত কোন রাণাকে দেখি না যে এক রাণী নিয়েই সন্তুষ্ট।

ঐটেই যে আমার সকলের চেয়ে গর্ব্বের বিষয় মাধবী।

আচ্ছা, রাণা যদি আর একটা রাণী করেন ?

সে যে হবার নয় মাধবী !

কখন কি হবার আশাও নেই ?

আমি যে রাণার মনকে একেবারে জয় কোরে রেখেচি।

তা ঠিক, একেবারেই জয় যাকে বলে।

মাধবী, তোর সেই গানটা একবার শোনা না !

কোন্‌টা, যেটা রাণা শুন্‌তে ভালবাসেন, সেইটে ?

তা আবার বোলে দিতে হবে ?

শোনাচ্চি, কিন্তু ভাল রকম বক্‌শিস্‌ চাই !

যা চাইবি তাই দেবো।

যা চাইবো তাই ?

হ্যাঁ, তাই-ই।

যদি রাণাকে চাই ?

ঐটি কেবল বাদ। প্রাণ থাকতে তা দিতে পারবো না; পরে যদি পারিস নিস্—বলিয়া, রাণী সহচরীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে উভয় তরুণীর মধুর-হাস্যে কক্ষ ভরিয়া উঠিল।

(২)

রাজধানীতে সংবাদ আসিল—রাণা জয়লাভ করিয়াছেন। নগর জুড়িয়া উল্লাসের ঢেউ বহিয়া গেল। প্রাসাদে, দুর্গে জয়পতাকা উড়ান হইল। বিজয়ী রাণাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিবার বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। নাগরিকগণ নগর-সজ্জায় ব্যস্ত হইল। রাণী নিজ মনোমত করিয়া রাণী-মহল সাজাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

যথাসময়ে মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জনের সঙ্গে রাণা রণবীর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। জয়-কোলাহলে নগর ভরিয়া গেল। রাণী সহচরীগণ সঙ্গে প্রাসাদ-শীর্ষে উপস্থিত হইলেন। আনন্দে ও স্বামীর গৌরবে আত্মহারা রাণীকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া মাধবী তাঁহার পার্শ্বে রহিল। বিজয়ী সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণসিংহাসনে তেজদীপ্ত হাস্য-বদন রাণাকে দেখিয়া জনমণ্ডলী "জয় রাণা রণবীরের

জয়” বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বামী-দর্শনের আনন্দ-আতিশয্যে রাণী মাধবীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। সহচরীদের মধ্যে হাসির বন্যা বহিয়া গেল। রাণা-মহলের তোরণে রাণার হাতী প্রবেশ করিল দেখিয়া, রাণী প্রাসাদ-শীর্ষ হইতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাণীর সহিত সহচরীরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপুল সৈন্য-বাহিনীর শেষভাগে একখানি শিবিকা আসিতে দেখিয়া রাণী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। শিবিকায় কে আসিতেছে, সহচরীরা কেহই বলিতে পারিল না। রাণী মাধবীকে শিবিকার সংবাদ লইতে বলিয়া নিজ কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যায় সমস্ত নগর সজ্জিত, দীপমালায় আলোকিত হইয়া উঠিল। রাণী-মহলের আলোকমালার শোভা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। রাণা আসিবার পূর্ব্বে মাধবীর নিকট হইতে সংবাদ শুনিবার জন্য রাণী উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। মাধবী সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাণী তাহার নিকট হইতে শুনিতে লাগিলেন।—

শত্রুর দুর্গ অবরোধের সময় রাণা সর্দ্দার-কন্যা পার্ব্বতীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চতুর সর্দ্দার রাণার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে কন্যাদানের প্রার্থনা জানাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। রাণা পার্ব্বতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। শুভদিন

দেখিয়া বিবাহ করিবেন। পার্ব্বতীর এক ভ্রাতাও সঙ্গে আসিয়াছে। উভয়েরই আপাততঃ আনন্দ-ভবনে বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাণীর আদেশে রাণী-মহলের সজ্জিত আলোকমালা নিবাইয়া দেওয়া হইল। জয়-উৎসবের গীত, বাদ্য, আনন্দ-কোলাহল সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল।

রাণা রাণী-মহলে আসিলেন। আলোকহীন পুরী,—উৎসবের কোন চিহ্নই নাই।

"চিত্রা আমি এসেছি"—রাণা রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রাণী ধীরে অগ্রসর হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিলেন।

রাণা রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাণী-মহলে জয় উৎসবের কোন আয়োজন নেই কেন চিত্রা?

"আমার যে পরাজয় রাণা"—বলিয়া, রাণী মুখ নত করিলেন।

প্রেমের ব্যাঘাত

বিনয়দা'র সঙ্গে সম্পর্ক তেমন বিশেষ না থাকিলেও বন্ধুত্ব ছিল খুব বেশী। সকলে বলিয়া হার মানিলে, বিনয়দা'র মা একদিন আমায় ধরিয়া বসিলেন যে, বিবাহে বিনয়দা'র মত করাইয়া দিতেই হইবে। তিনি ছেলের বিবাহ না দিয়া আর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না।

সেদিন ছিল কি একটা ছুটির দিন। দুপুরে বিনয়দা'র ঘরে ঢুকিয়া দেখি, তিনি খাটের উপর শুইয়া বই পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এই যে নির্ম্মল, কি খবর?" "খবর আছে বৈ কি!"—উত্তর দিয়া আমি তাঁহার পাশে গিয়া বসিলাম। হাত হইতে বইখানা টানিয়া লইয়া দেখি, সেখানি পরলোকতত্ত্বের বই। বলিলাম, "বিনয়দা, চিরকাল কি এই রকম নীরস আলোচনা নিয়েই

থাক্‌বে ?" বিনয়দা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা থাক্‌লে ক্ষতিটা কি শুনি।"

"ক্ষতি নেই! নিশ্চয়ই ক্ষতি। তুমি মার এক ছেলে, বিয়ে করে সংসারী যদি না হও, তাহলে এ সংসারটা আর থাকে কেমন করে।"

"ওঃ বুঝেচি, মা শেষে তোমাকেই মুরুব্বি পাকড়েচেন দেখ্‌চি।"

"দেখ বিনয়দা, তোমাকে এবার বিয়েতে মত দিতেই হবে। কতদিন আর এখন নয় তখন নয় করে কাটাবে। বত্রিশ বছর বয়স হো'ল, উপার্জ্জন ত এখন ভগবানের কৃপায় ভালই হচ্চে, আমরা এবার তোমার কোন আপত্তিই শুনবো না!"

বিনয়দা আমার হাত হইতে বইখানা লইয়া বলিলেন, "নির্ম্মল, তুমি ত আমার সমস্ত আপত্তির কারণ জানো না, তাই ও-কথা বল্‌চ। জানলে তুমিও বলবে, আমার বিয়ে না করাই উচিত।"

"তোমার এমন কোন কারণ থাকতে পারে না, যাতে তোমার পক্ষে বিয়ে করা অনুচিত। আমার সে রকম কোন কারণে বিশ্বাস নেই।"

বিনয়দা খাটের উপর হইতে নামিয়া প্রথমে ঘরের দরজায়

খিল দিলেন, পরে আলমারি হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। আমি বলিলাম—"ওখানা আবার কিসের খাতা বার কর্‌লে?" বিনয়দা খাতার একটা জায়গা খুলিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ। তারপর যদি কিছু বলবার থাকে বো'ল।"

বিনয়দা আবার খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন, আমি তাঁহার পাশে বসিয়া নিজের মনে পড়িতে লাগিলাম।

* * * *

বি-এ এক্‌জামিনের পর যখন লেখাপড়ার হাত হইতে কিছু-দিনের জন্য নিস্তার পাইলাম, তখন একবার পুরী বেড়াইয়া আসিবার সুযোগ ঘটিল। এক শুভদিনে পিসিমাকে সঙ্গে লইয়া পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পিসিমার ছোট দেবর তখন পুরীতে ওকালতী করিতেন, পরদিন যথাসময়ে আমরা তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

কুড়ি একুশ বৎসর বয়স হইলেও এ যাবৎ সমুদ্র দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। পুরীতে পৌঁছিয়াই প্রথমে যখন সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম, তখন বিস্ময় ও আনন্দে হৃদয় একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। সহরের বদ্ধ জীব এই বিশাল সৌন্দর্য্য মুগ্ধনেত্রে দর্শন করিতে লাগিলাম।

প্রেমের ব্যাঘাত

*　　　　*

সমুদ্র তীরই আমার ঘরবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে, আহার নিদ্রার সময় ব্যতীত সকল সময়ই সমুদ্রতীরে কাটাইতেছি। সাতদিন হইল এখানে আসিয়াছি, তাহার মধ্যে মাত্র-একদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়াছিলাম। সহরের মধ্যে যাইতে আর মোটেই ইচ্ছা হয় না, সমুদ্রের আকর্ষণ যে সকল সময়েই অনুভব করিতেছি। স্বর্গদ্বার হইতে চক্রতীর্থ পর্য্যন্ত দুবেলাই বেড়াইতেছি। দূরত্ব ত কম নয়, কিন্তু কোনই অবসাদ বোধ হয় না। সমুদ্রের হাওয়ায় কি অবসাদ আসিতে পারে? সকালে বৈকালে কত লোক যে সমুদ্রতীরে জমা হয়, তাহার সংখ্যা নাই। নিতান্ত দুর্ব্বল ছাড়া সকলেই যেন আনন্দে ভরপুর। যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই যেন বালক বালিকার মত আচরণ, সকলেই সঙ্কোচহীন। ঝিনুক সংগ্রহ যেন সকলেরই এখানকার একটা প্রধান কাজ। আমিও ত অনবরত ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছি। এত ঝিনুক যে কি করিব বুঝিতে পারি না, তবুও সংগ্রহের বিরাম নাই। একাই বেড়াই, সঙ্গী থাকিলে যে আরও কত আনন্দ পাইতাম বলিতে পারি না। অনেকে কেমন সহজে অপরিচিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া থাকে, আমি পারি না। যা হোক, সেজন্য আমার কোন অসুবিধা নাই।

মানস-কমল

স্বর্গদ্বারের শেষের দিকে লোক খুব কম। সকালে বৈকালে দুবেলাই দেখিতেছি, টালি-ছাওয়া নূতন ছোট বাড়িটার সামনে সমুদ্র-তীরে একটী সুন্দরী কিশোরী একা বসিয়া থাকে। বোধ হয় শরীর দুর্ব্বল, সেজন্য বেড়াইতে পারে না। আমাকে দেখিয়াছে কি না জানি না, কিন্তু আমি সাতদিন দুবেলাই তাহাকে ঐ জায়গাটীতে দেখিলাম! সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে, পিছনের দিকে কোন লোকের যাওয়া-আসা যেন তার লক্ষ্য করিবার কোন আবশ্যক নাই!

* *

একা একা আর যেন ভাল লাগিতেছে না। সকালে স্বর্গ-দ্বারের শেষে সেই কিশোরীর নিকটে দেখিলাম, একটী নয় দশ বছরের বালিকা ঝিনুক কুড়াইতেছে। চেহারায় বুঝিলাম, তাহারই ছোট বোন। হাতে কতকগুলি সুন্দর ঝিনুক ছিল, বালিকাকে দিলাম! সে ছুটিয়া গিয়া দিদিকে সেগুলি দেখাইল। কিশোরী একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। কি সুন্দর মুখ!

কেমন যে ইচ্ছা হইতেছে কিশোরীর সঙ্গে আলাপ করিবার বলিতে পারি পারি না। এ রকম ইচ্ছা হওয়াটা বোধ হয় অন্যায়! কেন, আলাপ করিতে দোষ কি?

বৈকালে গিয়া দেখি কিশোরী একাই বসিয়া রহিয়াছে,

বালিকা তখন সেখানে নাই। দুইজনের একবার চখো-চখি হইয়া গেল, আমি আরও আগাইয়া চলিয়া গেলাম! খানিক দূর ঘুরিয়া ফিরিবার সময় দেখিলাম, বালিকাটী সেই নূতন বাড়িটা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। ঐ বাড়িতেই তাহা হইলে ইহারা থাকে! আমার দেখা পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, ভাল ঝিনুক আর আছে কি না। কাল আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

* *

আরও সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, মানসীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। জ্বরে ভুগিয়া শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় মাসখানেক হইল তাহারা এখানে আসিয়াছে, যতদিন না শরীর ভাল রকম সারে ততদিন থাকিবে। সঙ্গে মা, ছোট বোন সরসী, দূর-সম্পর্কীয় এক বৃদ্ধ মাতুল ও একটী পুরাতন দাসী আসিয়াছে। পিতা এবং একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় বাড়িতে আছেন। মানসীর নিঃসঙ্কোচ কথাবার্ত্তা আমার বড় ভাল লাগে, যেন কত-দিনের পরিচয়। পিসিমাকে বলিয়াছি, পুরী খুব ভাল লাগিতেছে, আরও দিন কতক থাকিব। তাঁর খুব আনন্দ। তিনি বলেন, তাহা হইলে শরীরের খুব উন্নতি হইবে। শরীর ত ঠিকই আছে, তবে পিসিমার দৃষ্টিতে একজামিনের পরিশ্রমে আমি নাকি কেমন রোগা হইয়া গিয়াছি।

*   *

মানসীর মা'র মত মা খুব কমই দেখা যায়। অন্য কোন মা হইলে বোধ হয় অনাত্মীয় আমার সঙ্গে তাঁর মেয়েকে কথা কহিতেই দিতেন না। সত্যই তাঁর উপর আমার অনেকটা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। মানসীকে দেখিলে তের চোদ্দো বছরের কিশোরী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মা বলিলেন, "এই ষোলয় পড়েচে, অসুখে অনেকদিন ভুগ্‌চে ব'লে বয়সের চেয়ে ছোট দেখায়।" আমার কিন্তু বড় সুন্দর লাগে। দেড় বছর হইল বিবাহ হইয়াছে কিন্তু মাত্র তিন মাস শ্বশুর-ঘর করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহার পর হইতেই অসুখ চলিতেছে। তাঁরা না কি একবারও খোঁজ-খবর করেন না, কি অন্যায় কথা! অপরে খোঁজ না লইলেও, মানসীর স্বামীর খুব উচিত নিজের স্ত্রীর খবর রাখা। আজকালকার শিক্ষিত যুবক হইয়াও যে স্ত্রীর প্রেমের মূল্য বোঝে না, সে যে কি উপাদানে গঠিত বুঝিতে পারি না। মানসীর জন্য আমার দুঃখ হয়।

অন্যায় কি ন্যায় বুঝিতে পারিতেছি না। মানসীর দিকে যেন বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। তার সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সেও সকল সময়ে আমাকে কাছে পাইতে চায় বলিয়াই মনে হয়। এই কি প্রেমের লক্ষণ না কি? সে যে অপরের স্ত্রী, আমার কি এরূপ উচিত হইতেছে।

প্রেমের ব্যাঘাত

* *

সন্ধ্যার সময়, সরসী তখন কাছে ছিল না। মানসীতে আমাতে সমুদ্রের ধারে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। হঠাৎ কি রকম খেয়াল হইল, তাহার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলাম। সে তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "বিনয়বাবু, রাত্তির হয়ে গেল, বাড়ী যাই।" "আচ্ছা" বলিয়া, সঙ্গে তাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

* * * *

ইচ্ছা ছিল না, তবুও পিসিমাদের দলের সঙ্গে কণারকের মন্দির দেখিতে যাইতে হইল। একদিন সেখানেই কাটিল। পরের দিন ফিরিয়া আসিয়াই মানসীর কাছে গেলাম। মানসী অতি আগ্রহ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কাল একবারও এলেন না কেন, কোথায় গিয়েছিলেন ?" মনে যে কি রকম আনন্দ হইল বলিতে পারি না। দেখিতে না পাইলে কেবল আমারই নয়, মানসীরও মনে কষ্ট হয়। সমুদ্রের ধারে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কণারকের গল্প করিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গেল, গল্প যেন আর ফুরাইতে চাহে না। কখন যে মানসীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়াছি, মনে

নাই। মানসী কোন আপত্তি জানায় নাই। খানিকক্ষণ পরে মানসী বলিল,—"বিনয়বাবু, রাত্তির হয়ে গেল, বাড়ী যাই, কেমন?" যেন আমারই আদেশের অপেক্ষা। হাত ধরাধরি করিয়াই দুজনে উঠিয়া পড়িলাম।

মানসীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। মানসীও আমাকে ভালবাসিয়াছে নিশ্চয়ই। একদিন অদর্শনেই কি রকম ব্যাকুল ভাব। সেদিন প্রথম হাতে হাত দিতেই টানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু কাল কৈ একবারও ত সেরকম ভাব দেখিলাম না। জীবনে কি নূতন আনন্দই না অনুভব করিতেছি।

* *

সন্ধ্যার সময় হাতে হাত দিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি, সরসী ছুটিয়া আমাদের কাছে আসিতেই মানসী হাত টানিয়া লইল। খানিকক্ষণ পরে মানসী তার কাণে কাণে কি বলিয়া দিতে, সরসী ছুটিয়া বাড়ীর দিকে গেল। মানসী নিজের হাতটা আবার আমার দিকে আগাইয়া দিল, আমি দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। কথা কহিতে কহিতে কখন যে দুইজনেই চুপ করিয়া গিয়াছি মনে নাই। দেখি মানসী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে। কি সে দৃষ্টির মাদকতা! আমি কেমন হইয়া গেলাম। বিশাল সমুদ্র—সমগ্র জগত

আমার সম্মুখ হইতে লোপ পাইয়া গেল। অন্তরে বাহিরে কেবল এক সুন্দর মুখের করুণ দৃষ্টি। আমি প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে মানসীকে টানিয়া লইলাম। মানসীর মুখ দিয়া কেবল দুইবার অস্ফুট "—না—না" শব্দ বাহির হইল। চুম্বনে চুম্বনে তাহার ওষ্ঠ ও গণ্ড রক্তিম করিয়া তুলিলাম।

যখন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, দেখিলাম মানসী আমার সম্মুখে বসিয়া মাথা নত করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার একখানি হাত তুলিয়া ধরিতেই, সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রন্দনের সুরেই বলিয়া উঠিল—"আমার যে থাইসিস্—"

"এঁ্যা, থাইসিস্!"—আমার মুখ দিয়া আর কোন কথা তখন বাহির হইল না।

সরসী একথোলো আঙ্গুর লইয়া আসিয়া আমার হাতে দিল। বলিল,—"বাবা, আজ এক টুক্‌রি আঙ্গুর পাঠিয়েচেন। আপনার জন্যে এগুলো আনলুম।" কোন উত্তর না দিয়া সেগুলি লইলাম। মানসী নীরবে উঠিয়া সরসীর সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল। আঙ্গুরের থোলো সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি হইতে গলাটা যেন কেমন খুসখুস্ করিতেছিল। কি রকম ভয় হইল, পরদিনই কলিকাতায় রওনা হইলাম। বাড়ীতে যখন

পৌঁছিলাম তখন রীতিমত কাসি আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তারকে দেখাইতে তিনি বলিলেন—"ও কিছু নয়। গাড়ীতে ঠাণ্ডা লেগে একটু কাসি হয়েচে, আপনিই সেরে যাবে।" আমার ভয় কিন্তু একটুওকমিল না।

*   *   *   *   *

পড়া শেষ করিয়া খাতা বন্ধ করিতেই, বিনয়দা বলিয়া উঠিলেন—"এখনও তুমি কি আমায় বল বিয়ে করতে ?"

"নিশ্চয়ই, একশোবার বল্‌বো! অসময়ে অপাত্রীতে প্রেম করতে গিয়েছিলে, তাতেই ব্যাঘাত ঘটেচে। আরে, এতদিন এ সব আমাকে জানাতে হয়!"

"কিন্তু আমার স্বাস্থ্য যে ভাল নয়। আমি যে 'ইন্‌ফেক্‌টেড্‌।"

"তোমার স্বাস্থ্য ভাল নয় ? তুমি ইন্‌ফেক্‌টেড্‌ ?"

"আহা, এখন কোন লক্ষণ না দেখা গেলেও পরে প্রকাশ পেতে কতক্ষণ!"

"তা ত বটেই। কবে এগার বছর আগে থাইসিস্‌ রুগীর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলে আর নিস্তার আছে। আচ্ছা, শীগ্‌গিরই এন্টি ইন্‌ফেক্‌সন্‌ চুমুর ব্যবস্থা করে দিচ্চি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহিরে গেলাম। বিনয়দা খাটে শুইয়াই চেঁচাইতেছিলেন—"ওহে নির্ম্মল, আরো কথা আছে শুনে যাও।"

পূজারী

ক্ষুদ্র রাজ্য প্রশান্তিপুর।

পর পর দুই বৎসর অজন্মায় প্রজাদের বিষম অন্ন-কষ্ট। সময় অতীতপ্রায়, অথচ বিন্দুমাত্র বারিপাত নাই। এ বৎসরও শস্য না জন্মিলে প্রজাগণের জীবন-রক্ষা ভার।

রাজা জনমিত্র প্রজাবৎসল। রাণী দয়াদেবী মূর্ত্তিমতী দয়া। ক্ষুদ্র রাজভাণ্ডার প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। প্রত্যহ দরিদ্র প্রজাদের অন্নদান দয়াদেবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য।

রাজভাণ্ডার ক্রমশঃ নিঃশেষপ্রায়,—ভাবনার কথা। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। জনমিত্র চিন্তামগ্ন; কোন্ পাপে তাঁহার রাজ্যের এত দুর্দ্দশা!

দয়াদেবী বলিলেন—শ্রীশ্রীরাজ্যলক্ষ্মী মাতা বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণ ত দেখিতে পাই না।

রাজ-পূজারী দেবীদাসকে ডাকান হইল।

রাজা বলিলেন—মাতা রাজ্যলক্ষ্মী কুপিতা হইয়াছেন।

পূজারী বলিলেন—দৈনিক পূজা ত পূর্ব্বের মত নিয়মিত ভাবেই চলিতেছে।

রাণী বলিলেন—একদিন ষোড়শোপচারে দেবী-পূজার আয়োজন করি।

রাজা বলিলেন—ভাল কথা।

*　　*　　*　　*

দুই দিন ধরিয়া দয়াদেবী পূজার আয়োজনেই ব্যস্ত। দরিদ্র প্রজাদের অনেককে দ্বারীরা এই দুই দিন অন্ন না দিয়াই ফিরাইয়া দিয়াছে।

আজ বিশেষ পূজার দিন। পূজার অন্তে প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্রগণকে অন্নদান জন্য বিপুল আয়োজন হইয়াছে।

রাজবাটী হইতে ভারে-ভারে নৈবেদ্য দেবীর মন্দিরে প্রেরিত হইতেছে। পূজারী দেবীদাস যথাযোগ্য স্থানে সেগুলি সজ্জিত করিতেছেন। মহারোহে পূজা,—পূজারীর আজ মহা আনন্দ!

পূজার সময় আগত-প্রায়; এখনও ত রাজা রাণী উপস্থিত হইলেন না। দেবীদাস মন্দিরের বাহিরে আসিলেন।

পূজারী

সম্মুখে শিশু-পুত্র ক্রোড়ে ভিখারিণী।—"ঠাকুর আর অপেক্ষা সহে না। দুই দিন অনাহারে আছি। শীর্ণ বক্ষ যে দুগ্ধহীন, শিশু একেবারে নির্জ্জীব!"

"ভিখারিণী এ কি তোর রাক্ষসী ক্ষুধা। তোর মৃত্যুই শ্রেয়। দেবীর ভোগের অগ্রে, এই পাপ-কথা তোর মুখে।"

"ঠাকুর, শিশুকে যে আর বাঁচাইতে পারি না। দয়া কর ঠাকুর! শিশুর জন্যই ত নিজের বাঁচিবার এত ইচ্ছা। আমার ত আর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই ঠাকুর!"

দেবীদাস মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণে তাম্র-কুণ্ডে দুগ্ধ ভরিয়া ভিখারিণীর সম্মুখে আনিয়া দিলেন। মাতা শিশুকে দুগ্ধ পান করাইলেন। মৃতপ্রায় শিশুর দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। ভিখারিণীর চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

রাজা ও রাণী উপস্থিত হইলেন।

এ কি? দেবীদাস মন্দিরদ্বারে বসিয়া নিজ হস্তে এক একটি করিয়া উপাদেয় সামগ্রী ভিখারিণীকে দিতেছেন; সে আনন্দের সহিত ভোজন করিতেছে। দেবীদাস একবার মন্দিরমধ্যে দেবী-প্রতিমার দিকে, আর একবার বাহিরের ভিখারিণীর দিকে চাহিতেছেন; চক্ষের ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

রাণী বলিলেন—কি অমঙ্গল! পূজার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইল। পূজারীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে।

রাজা গম্ভীর স্বরে ডাকিলে—দেবীদাস!

কোনই উত্তর মিলিল না।

আবার ডাকিলেন—দেবীদাস!

পূজারী মন্দির-দ্বারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সেবা যত্নেও সে সময় দেবীদাসের মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইল না। রাজ-আজ্ঞায় শিবিকা করিয়া পূজারীকে তাঁহার নিজ আলয়ে রাখিয়া আসা হইল। ভিখারিণী যে কখন চলিয়া গেল, কেহ জানিতেও পারিল না।

নূতন আয়োজন করিয়া, অপর পূজারী আনাইয়া দেবীপূজা সমাধা করা হইল; কিন্তু রাজা ও রাণীর মনে দুর্ভাবনা রহিয়া গেল।

* * * *

রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিয়া দয়াদেবীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি রাজাকে উঠাইলেন—চল, আমরা প্রভাতের পূর্ব্বেই একবার দেবীদাসকে দেখিয়া আসি; তাঁর দেবী-দর্শন হইয়াছে।

আরও বলিলেন—স্বপ্নে মাতা শ্রীশ্রীরাজ্যলক্ষ্মী আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমাদের পূজা সার্থক হইয়াছে। তিনি ভিখারিণী-রূপে দেবীদাসের হস্ত হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন।

পূজারী

রাজা ও রাণী গিয়া পূজারীকে প্রণাম করিলেন।

দেবীদাস দয়াদেবীকে বলিলেন—মা, আপনার জন্য আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে। দীন-দুঃখীদের উপর আপনার অসীম দয়া; সেই কারণে দেবী স্বয়ং ভিখারিণীর রূপ ধরিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ভিখারিণীতেই দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম।

প্রেমের মিলন

পশ্চিমের একটী ক্ষুদ্র সহরে দ্বি-প্রহরে লোক-কোলাহলহীন একখানি সুন্দর বাংলায় দুইটী বঙ্গীয় তরুণীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। গৃহস্বামী স্থানীয় ব্যারিষ্টার মিষ্টার সেনের স্ত্রী লীলাবতী, সরকারী হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী মনীষাকে বলিলেন— আমার কাছে ভাই সঙ্কোচ কোর না, কি বল্‌বার আছে বল।

বল্‌চি ভাই, শুনে কিন্তু আমি একটুও বিশ্বাস করিনি। মিষ্টার সেনের সঙ্গে না কি তোমার—

হ্যাঁ ভাই ঠিক শুনেচ, সামাজিক হিসেবে আমরা বিবাহিত নই। কিন্তু উনিই আমার স্বামী।

ঠিক বুঝলুম না ভাই!

সবটা না শুনলে ত বুঝবে না।

প্রেমের মিলন

যদি না বাধা থাকে, সবটাই শুন্‌বো ভাই!

বাধা ভাই কিছুই নেই, সবটাই তোমায় বল্‌চি।

*　　*　　*　　*

তোমার ত ভাই মনে আছে, যখন আমরা সিক্সথ্‌ ক্লাসে পড়ি তখন আমার মা মারা যান। তখন আমার বয়েস এগার বছর। আমি ত দিন-রাত কেঁদেই অস্থির। বাবা কিছুতেই আমাকে থামাতে পারতেন না। থামাবেন কি, আমাকে বোঝাতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলতেন। তা দেখে আমার কান্না আরও বেড়েই যেত। বাবার চেয়ে অনেক বড় আমার এক পিসিমা বাড়ীতে ছিলেন; বলতেন—তার ত ভাগ্যি ভাল, কপালে সিঁদুর হাতে নোয়া নিয়ে, স্বামীর কোলে মাথা রেখে গেল, এ রকম কটা হয়! আমার ত পোড়া কপাল, তাই সব খেয়ে এখনও বেঁচে আচি। আরও কতদিন ভোগ আছে কে জানে? আমার কিন্তু পিসিমার কথা মোটেই ভাল লাগত না। সত্যি সত্যি, মনে করতুম, পিসিমা মারা গিয়ে যদি মা বেঁচে থাকতেন ভাল হো'ত।

বাবা তো স্কুলে মাষ্টারী করতেন জান। বাড়ীটা নিজেদের ছিল বলে তাঁর সামান্য আয়েই আমাদের সংসারটা এক রকম চলে যেত। সংসারে ছিলুম মোটে চারজন লোক—মা, বাবা, আমি আর পিসিমা। এক জন ঠিকে-ঝি এসে বাঁটনা বেঁটে আর বাসন মেজে দিয়ে যেত। মা

নিজেই আর সব কাজ করতেন। পিসিমা নিজের রান্না সেরে আর বড় সময় পেতেন না। মা তাঁকে সহজে কোন কাজও করতে দিতেন না। খেটে খেটে শরীরের যত্ন না করেই তিনি মারা গেলেন।

পড়ানতে বাবার বেশ নাম ছিল। পাড়ার মধ্যে হরনাথ সেন ছিলেন সকলের চেয়ে বড়লোক। বাবা আগে তাঁর ছোট ছেলেকে পড়াতেন। পাড়ার লোক এবং মাষ্টার মশাই বলে সেনেদের বাড়ীতে বাবার বেশ খাতির ছিল। বাবার সঙ্গে খুব ছোট বেলা থেকেই আমি তাঁদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতুম। বাড়ীর সকলেই আমাকে ভাল-বাসতেন। দুই ছেলে বিনোদ ও বিনয় আমার বাবাকে কাকা বলে ডাকতেন। আমি তাঁদের দাদা ব'লে ডাকতুম। বড় ও ছোট ভায়ে বয়সের অনেক তফাত ছিল, বোধ হয় চোদ্দ পনের বছরের। বড় ভায়ের পর তিন বোন, তারপর ছোট ভাই। বড় ভাই ওকালতি করতেন।

আমার মা যখন মারা যান, তখন বিনয় দাদার বয়েস কুড়ি বছর, তিনি বি-এ পড়চেন। তিনি এসে আমাকে খুব সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন—লীলা, মা কি সকলেরই বেঁচে থাকেন, এই যে আমাদেরও মা নেই। তাঁর কথাতে মনে যেন কতকটা সান্ত্বনা পেতুম—তাই ত ওঁদেরও মা নেই, ওঁদেরও আমারই মতন অবস্থা।

প্রেমের মিলন

মা মারা যাবার পর সেনেদের বাড়ী আমার যাওয়া-আসা আরও বেড়ে গেল। কখনও বাবার সঙ্গে যেতুম, কখনও বা ছোড়দা এসে নিয়ে যেতেন। বড় বৌদিদি আমাকে খুব আদর-যত্ন করতেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরা আমাকে পেলে যেন আনন্দে মত্ত হয়ে উঠত। তারা আমাকে পিসিমা বল্‌তো। আমি তাদের সকলকে ভালবাসতুম।

বাবার কাছেই আমি স্কুলের পড়া তৈরী করতুম। মা মারা যাবার পর থেকেই বাবার মন যেন ভেঙ্গে গেছলো, তিনি বেশী সময়ই অন্য-মনস্ক হয়ে থাকতেন। অনেক সময় দুতিনবার জিজ্ঞেস করেও উত্তর পেতুম না, এজন্যে পড়া তৈরীর অসুবিধা হো'ত। পড়াশুনো ভাল হচ্ছে না শুনে ছোড়দা একদিন বল্লেন—লীলা, আমার কাছ থেকে পড়া করে নিয়ে যেও, কাকা এখন মনের স্থিরতা নেই, তাঁকে আর বেশী ব্যস্ত কোর না। সেই থেকে ছোড়দার কাছেই বেশীর ভাগ পড়ার সাহায্য পেতুম। ছোড়দা খুব যত্ন করে পড়াতেন। বিকেলে যখন ওঁদের বাড়ী যেতুম, তখন সঙ্গে বই খাতা নিয়ে যেতুম। ছোড়দা সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে, আমায় আগে খানিকক্ষণ পড়িয়ে তবে নিজের লেখা-পড়া আরম্ভ করতেন। এক-একদিন সকালে তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেও পড়া বলে দিতেন।

মানস-কমল

থার্ড ক্লাসে যখন উঠ্‌লুম, তখন আমি চোদ্দ বছরে পড়েচি। সেবার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলুম। স্কুল থেকে বাড়ী এসে বাবাকে বল্‌তে, তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। বল্লেন—এ কেবল বিনয়ের সাহায্যের জন্যেই হয়েচে, আমি ত একদিনও তোমায় ভাল করে পড়াতে পারিনি। সে কথা সত্যিই, ছোড়দা যে রকম যত্ন নিয়ে পড়িয়েচেন, তাতেই প্রথম হতে পেরেচি। সন্ধ্যার সময় ছোড়দাদের বাড়ীতে অনেকক্ষণ ছিলুম, সেদিন তাঁর ফিরতে দেরী হয়েছিল। তাঁর পড়বার ঘরে ঢুকতেই তিনি এগিয়ে এলেন—আজকের কি খবর লীলা? কি জানি কি মনে হো'ল, "আপনার জন্যেই এবারে পরীক্ষায় প্রথম হয়েচি" বলে, তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি 'থাক্ থাক্' বলে, তাড়া-তাড়ি আমার হাত ধরে তুললেন। বৌদিদি যে কখন পেছনে এসেচেন টের পাইনি, হঠাৎ পেছন থেকে বলে উঠলেন—ঠাকুরপো এ রকম ছাত্রী আর পাবেনা, খুব ভাল কোরে পড়াও, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। আমার বড় লজ্জা করতে লাগল যে, আমার প্রণাম করাটা বৌদিদি দেখে ফেল্‌লেন।

পরের দিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করচি, বৌদিদি ডেকে আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বড়দা তখন কোর্ট থেকে ফিরে এসে, ইলেক্‌ট্রিক পাখাটা খুলে দিয়ে একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে

আছেন। ঘরে ঢুকেই বৌদিদি বল্লেন—লীলা এবার প্রথম হোয়ে ক্লাসে উঠেচে, শুনেচো তো? মাষ্টার মশাইকে সেজন্যে পুরস্কার দিতে হবে। বড়দা হেসে বল্লেন—কি পুরস্কার দেবে শুনি। আমি ঠিক করেচি, এই ছাত্রীটিই পুরস্কার দেবো—বলে, বৌদিদি আমার গালটা একটু টিপে দিলেন। আমার এত লজ্জা করতে লাগ্‌ল যে, আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সেদিন আর ছোড়দার সঙ্গে দেখা করা হো'ল না।

দু-তিন দিন পরে যখন আবার গেলুম, ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখেই 'কাকিমা এসেচে' 'কাকিমা এসেচে' বলে চেঁচাতে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লুম, কাকিমা আবার কি? বৌদিদির বড় মেয়ে মিনা তখন প্রায় দশ বছরের, সে বল্‌লে—বা রে, কাকাবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তুমি কাকিমা না ত কি? মা বোলেচে, আমরা সকলে কাকিমা বোল্‌বই। বৌদিদিকে বল্‌লুম—এ রকম করলে আমি কিন্তু আসবো না। আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমার মাষ্টার মশাইকে বোলে ওদের সব শাস্তি দেয়াবো—বলে, বৌদিদি আমার গালটা টিপে দিয়ে খুব হাসতে লাগলেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে উঠ্‌লুম, সেবারে কিন্তু ফার্ষ্ট হতে পারিনি—তিনজনের নীচে হয়েছিলুম। নীচে হবার কারণ ছিল, পড়াশুনো ভাল

করে করতে পারিনি। ছোড়দার কাছে গিয়ে পড়া জেনে নিতে কি রকম লজ্জা কোর্‌ত, সেজন্যে নিজে নিজেই পড়া করতুম। তিনি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন—পড়া জেনে নিতে আস না কেন? বলেছিলুম—আপনার পরীক্ষার বছর, আপনার সময় কম, আমি বাবার কাছেই পড়চি। তিনি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, লজ্জা করে বলে আমি যাই না। আমিও বুঝতে পারতুম, তিনিও যেন আগের মত নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারতেন না, বিশেষতঃ তাঁদের বাড়ীতে। সকালে আমার পড়বার সময় এক একদিন আমাদের বাড়ীতে আসতেন, কি রকম পড়া হচ্চে, দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তিনি চলে যাবার পর খানিকক্ষণ আমার পড়াশুনো যেন গোলমাল হয়ে যেত। যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারতুম না, কিন্তু চলে গেলেই কেবল তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হো'ত।

ছোড়দা শেষ ল-পরীক্ষায় ভাল করে পাশ হলেন। তাঁদের বাড়ীতে খুব ধুম করে খাওয়া-দাওয়া হো'ল। আমার সঙ্গে সেদিন পিসিমাও গেছিলেন। বৌদিদির সঙ্গে পিসিমার কথা হচ্ছিল, আড়াল থেকে শুনলুম—

বৌমা, এইবার বাছা বিয়ের যোগাড়টা করে ফেল।

পিসিমা বল্লেন, আমার·ত খুবই ইচ্ছে যে এখনই হয়ে যায়। উনিই কেবল আপত্তি করেন যে, বিলেত থেকে ফিরে এলেই বিয়ে হবে, আর দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

এখনই ত পনের বছরেরটি হো'ল, আবার দু'বছর কি অপেক্ষা করা ভাল দেখায়, তুমিই বল না বাছা, আমাদের কালে ত কারুর ন-বছর পেরুতে পেত না।

কি বোল্‌ব বলুন, ওঁকে ত আর বোঝাতে পারি না। উনি বলেন, কি আর এমন বড় হয়েচে ?

আর শোন্‌বার সাহস হো'ল না, পাছে কেউ টের পায়।

ছোড়দার বিলেত যাবার সময় হয়ে এল, সেখান থেকে ব্যারিষ্টারী পাস দিয়ে ফিরে আসতে দু'বছর লাগবে। যাবার দুদিন আগে আবার একটা ছোট-খাট রকমের খাওয়া-দাওয়া হো'ল। আমি যে কাপড় জামা পরে গেছিলুম, বৌদিদি সে সব ছাড়িয়ে তাঁর নিজের ভাল বেনারসী শাড়ী জ্যাকেট আমায় পরিয়ে দিলেন। ছোড়দার সামনে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—ঠাকুরপো কেমন দেখাচ্চে বল দিকিন ? ছোড়দা হেসে বল্লেন—খুব সুন্দর দেখাচ্চে। আমার বড় লজ্জা করতে লাগ্‌ল, তিনি কিছু না বলতেন, বেশ হো'ত।

সেদিন বাড়ি শুদ্ধ সকলের একসঙ্গে ফটো তোলা হ'ল।

ছোড়দার একলার একখানা ফটো তোলবার পর, বৌদিদি জোর করে আমারও একখানা আলাদা ফটো তোলালেন।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে আর ঘুমুতে পারলুম না। সমস্ত রাত্তিরটা জেগে জেগেই কেটে গেল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলুম, তবুও যেন মনটা হাল্‌কা হো'ল না। মিলনের আগেই যে বিচ্ছেদের কষ্ট ভোগ করতে হবে—কি দুর্ভাগ্য আমার। মা যদি বেঁচে থাকতেন তবুও অনেকটা শান্তিতে থাক্‌তুম। কি কোরে দুটো বছর কাট্‌বে।

বিলেত যাবার দিন সকালে ছোড়দা আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিলেন। বাবা আর পিসিমার কাছে বিদায় নিয়ে তিনি আমার পড়বার ঘরে এলেন।—"লীলা আমি চল্লুম। আবার কতদিন পরে দেখা হবে, ছোড়দাকে যেন ভুলে যেও না।" আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে তাঁর পায়ে প্রণাম করতেই তিনি হাত ধরে তুলে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগ্‌ল, আমি কেঁদে ফেল্‌লুম। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মুখ তুলতেই দেখি তাঁর চোখেও জল। তিনি রুমালে চোখ মুছে বল্‌লেন, বড় কষ্ট হবে নয়? কি উত্তর দোবো। মুখ যে তুলতে পারি না, জলে যে চোখ ভরা। "তবে যাই"—হঠাৎ তিনি আমার মুখটা তুলে ধরে আবেগ ভরে চুমু খেলেন। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিজেকে আর

সামলাতে পারলুম না, মেঝেতে বসে পড়লুম। "চল্লুম"—বলে, তিনি আমার কোলে তাঁর নিজের একখানা ফটো ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হৃদয়-দেবতার প্রথম চুম্বনের যে কি মাদকতা, কি করে তা জানাব, সে কি জানান যায়। যখন সে মাদকতার ঘোর কাট্‌ল, তখন দেখি প্রায় নটা বাজে—আমার পড়া থেকে ওঠবার সময় হয়ে গেছে।

এক বছর কেটে গেল। কি রকম করে যে কাট্‌ল তা মনে নেই। পিসিমা অবিরত বলায়, বাবা আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। দুদিন পরে সংসার করতে হবে, নিজের হাতে সব কাজ করতে শেখা চাই। সব কাজই করতুম। প্রায়ই নতুন নতুন রান্না করে বাবাকে খাওয়াতুম, বৌদিদির ছেলে মেয়েরাও এসে খেয়ে যেত। মনে মনে ভাবতুম, এই রকম করে আর একজনকে কবে খাওয়াব। তাঁর খবর নিয়মিতই পেতুম, বৌদিদির কাছে চিঠি এলে তিনি সেটা আমায় পাঠিয়ে দিতেন। আমি সে চিঠি কতবার করে যে পড়তুম তা বল্‌তে পারি না। মনে হো'ত, আমায় যদি একখানা লেখেন। তাঁর ফটোখানা আমার ডেস্কের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলুম। যখনই ইচ্ছে হো'ত সেখানা বার করে দেখতুম। দেখে দেখে আর আশ মিটত না। বৌদিদির কাছে শুনেছিলুম, তিনি আমার একখানা

ফটো তাঁর বাক্সের ভেতর দিয়েছিলেন। এই দেবার জন্যেই আমার আলাদা করে ফটো তোলান হয়েছিল। তাঁর ফটোটা দেখতে দেখতে মনে হো'ত, তিনিও এমনি করে আমার ফটো যখন-তখন ছাখেন। মনে যেন একটু আনন্দ অনুভব করতুম। কতদিনে তিনি ফিরবেন, কেবল তারই দিন হিসেবে অনেক সময় কেটে যেত।

বৌদিদির আর একটি খোকা হয়েচে। খোকা এখন এক বছরের। আমি গেলে আমার কোলে এমন করে ঝাঁপিয়ে আসে, যেন সে তার মার চেয়েও আমায় বেশী ভালবাসে। ছোট খোকা হবার পর থেকেই বৌদিদির শরীর যেন একবারে ভেঙ্গে গেছিলো, সব সময়েই প্রায় তিনি অসুখে ভুগতেন। আমি গেলে কিন্তু আমার আদর যত্নের কোন কম হবার যো ছিল না। তিনি যেন ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মনে মনে ভাবতুম, আমি এ সংসারে কি সুখেই দিন কাটাব—কবে সে সুখের দিন আসবে।

বৌদিদির অসুখটা ক্রমশঃ বেড়ে গেল। ডাক্তাররা বল্‌লেন আর বাঁচবার আশা নেই। বৌদিদির মা এলেন মেয়ের সেবা করতে। আমাকে রোজই যেতে হো'ত। সমস্তক্ষণ তাঁর পাশে বসে থাকতুম, কোন কিছু করতে গেলে তিনি বারণ করতেন—মা রয়েচেন, এত লোকজন রয়েচে, তুমি ব্যস্ত হও কেন ভাই। আমি বসে কেবল

তাঁর সঙ্গে গল্প করতুম। কোর্ট থেকে বাড়ী এসেই বড়দা একবার করে দেখতে আসতেন। সে সময় আমার বড় লজ্জা কর্'ত, কিন্তু বৌদিদি আমায় উঠে যেতে দিতেন না। বড়দা অসুখের দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করে পোষাক ছাড়তে 'চলে যেতেন। একদিন একটু বেশীক্ষণ বসে ছিলেন, বৌদিদি বল্‌লেন—দেখ ত লীলা কেমন সুন্দরটী হয়েছে, যত দিন যাচ্চে রূপ যেন ফেটে পড়চে। এখনও ঠাকুরপোর আস্‌তে ছমাস দেরী, দুজনের মিলনটা দেখা আমার ভাগ্যে আর ঘট্‌বে না দেখ্‌চি। ইচ্ছে করে, লোক পাঠিয়ে এখনই ঠাকুরপোকে ধরে নিয়ে আসি।

চারদিন খুব বাড়াবাড়িতে গেল, ডাক্তার বল্‌লেন, 'আজকের রাত না কাটলে কিছু বোঝা যাচ্চে না। আজকের রাত ত কাট্‌বেই না বেশ বুঝতে পারচি, বুক ফেটে কান্না বেরুচ্চে, কিছুতেই চোখের জল চাপ্‌তে পার্‌চি না। বৌদিদির একটু জ্ঞান হোল, ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লেন—ভাই, তোমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে যেতে পারলুম না, আর যদি কোন রকমে ছ'টী মাস বেঁচে থাকতে পারতুম! ভগবান আছেন, তোমাদের মিল হবেই ভাই। আশীর্ব্বাদ করচি, দুজনের যেন মনের সুখে দিন কাটে। ছেলেমেয়েদের দেখো, ছোট খোকা ত ভাই তোমা-অন্ত প্রাণ, তোমার কাছে সে সুখেই থাকবে, এই আমার শান্তি।

অন্তিম সময়ে ইসারায় বড়দার পায়ের ধুলো মাথায় দিতে বল্লেন। বড়দা তাই করলেন, তাঁর হাত তখন কাঁপ্‌চে। অমন সময়েও যে তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পেরেচেন, এই তাঁর বাহাদুরী। পুরুষ মানুষ বলেই এতটা সম্ভব। ছোট খোকা আমার কোলেই ছিল, তার হাতটা নিয়ে চুমু খেয়ে, সেই হাতটা আমার হাতের ভেতর দিয়ে দিলেন। তারপর স্বামীও ছেলে-মেয়েদের দিকে ছুবার চেয়েই চোখ চিরদিনের জন্যে স্থির হয়ে গেল।

তিনমাস কেটে গেছে। বৌদির মৃত্যুর শোকটা সব সময় মনে জেগে থাকলেও, একটা আনন্দ এই হো'ত যে, আর তিন মাস পরেই তিনি আসচেন। এতদিন যখন কেটে গেল, আর তিন মাসও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর!

ছোট খোকা সব সময়ই আমার কাছে থাকে, আমাকেই বলে 'মা'। অন্য ছেলেমেয়েদের তাদের দিদিমাই দেখ্‌চেন। তবুও তারা দিনের মধ্যে তিন চারবার আসে, আমার কাছে—খোকার কাছে। আমিও প্রায় যাই, পিসিমাও এক এক দিন যান।

নিজের কানকেও বিশ্বাস কর্‌তে পারছিলুম না, পিসিমা বাবাকে বল্‌ছিলেন—মেয়ে সতের বছরের হো'ল, আর এক দিনও দেরী করা উচিত নয়। বিনয়ের ত্যাথো এখনও আসবার দেরী, আশায় আশায়

আর কত দিন থাকা যায়। নানা লোক নানা রকম বলতে আরম্ভ করেচে। বলি কি, তুমি আর অমত কোর না। আর বিনোদের এমনই বা কি বয়েস, চল্লিশের বেশী ত নয়। বেটাছেলের ও-বয়েস কিছুই নয়। সংসারটা তা না হলে থাকে না। ছেলেমেয়েগুলো সকলেই ত ওর খুব নেওটো, ছোট খোকাটার ত ওই মা। আর পয়সা ত বিনোদই রোজগার করচে, ওরই পয়সাতে ত ছোট ভাই বিলেতে পড়চে। সে ফিরে এসে মানুষ হয়ে দাঁড়াতে অনেক দেরী। আমি বলি কি, বিনোদ নিজে যখন লীলাকে বিয়ে করবার কথা পেড়েচে, তখন আমাদের এখনই রাজি হওয়া উচিত।

বাবা বল্লেন—দিদি, সবই বুঝি। মেয়ে বড় হয়েচে, তারও একটা মত অমত আছে; সেটা ত জানা চাই।

এতে আবার মেয়ের অমত কি? রাজরাণী হবে, এমন ভাগ্যি ক-জনার হয়। মায়ের অনেক পুণ্যির জোর তাই এইটি ঘটচে। আজ যদি বৌ বেঁচে থাকত, তার কি আর আনন্দ রাখবার জায়গা থাকত—বলে, পিসিমা কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলেন।

শুভ কি অশুভ দিনে জানিনা উকিল বাবু বিনোদবিহারী সেনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত বাড়ীতেই আমি স্থান পেলুম। তবে যে ভাবে চেয়েছিলুম সে ভাবে

নয়, অন্য ভাবে। আর দু মাস পরেই তিনি বিলেত থেকে আস্‌ছেন, পাছে বাধা পড়ে, তাই উকিল বাবু ওকালতী বুদ্ধি করে ছোট ভায়ের বাক্‌দত্তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে আনলেন। দোহাই দিলেন, ছেলে মেয়েদের অবস্থার একশেষ—সংসার অচল। স্ত্রীর মৃত্যু-শয্যার পাশে আমায় অনবরত দেখে, তিনি নাকি আমার রূপ-মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্ত্রীর টানে যত না হোক, তিনি নাকি আমার টানেই কেবল সে-ঘরে যেতেন। আমি নাকি দেখতে খুবই সুন্দরী হয়েচি। এ সব কথা যেন আমার কাছে অভিনয় বলেই মনে হো'ত। হায় রে পুরুষ!

তিনি আসছেন, আর দুদিন পরেই বাড়ী এসে পৌঁছবেন। আনন্দ দুঃখ যে একসঙ্গে এসে বুকের ভেতর তোলপাড় করে দিচ্চে। উকিল বাবু বলে দিলেন—বিনয় এলে তার সামনে বেরিও না। আমাদের দুজনের বয়সের দোষে অমঙ্গল ঘটা বিচিত্র নয়। কি বোল্‌ব, আমার যে কেবল শোনবার অধিকার। বোল্‌তে লজ্জাও হোল না, নিজে যে কতটা অমঙ্গল করলে তার কৈফিয়ত দেবে কাকে?

তিনি এসেছেন, বার-বাড়ীতে লোক বোঝাই। ইচ্ছে হচ্চে ছুটে গিয়ে দেখে আসি। কখন ভেতরে আসবেন, খাবার সময় ত দেখা পাবই। সময় যেন কাটতে চায় না। কত উঁকি ঝুঁকি মারচি, কোথা থেকে কি ছাই একটুও দেখা যায়! উকিল বাবুর কোর্টে যাবার

সময় হয়ে এলো, তিনি ভেতরে এলেন, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। আমারি অন্তরের ব্যস্ততা যেন বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল, তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন। পোষাক পরবার সময় আবার সাবধান করে দিলেন, বিনয়ের সামনে যেন আমি বার না হই।

উকিল বাবু ত বেরিয়ে গেলেন, কই তিনি এখনও ভেতরে আসচেন না কেন। বন্ধুরা যেন একদিনে দু-বছরের সব কথা শুনে নিতে চায়—বড় অন্যায়।

এই যে ভেতরে আসচেন, ছেলে মেয়েরা সব হাত ধরে আস্চে। আমার সর্ব্বশরীর যে কাঁপচে, আমি কি সামনে বেরুব না—উকিল বাবু বারণ করে গেছেন। ভেতরে এসে পড়েচেন, আমি আর থাকতে পারলুম না, কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। আমার দিকে চেয়েই ডেকে উঠলেন—"লীলা!" আমি তাঁর পায়ের তলায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

তারপর দু মাস পরে আমরা এখানে চলে এসেছি। এই দেড় বছর হো'ল এখানে আছি। স্বামী স্ত্রীতে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্চি। ছোট খোকার জন্যে কেবল মাঝে মাঝে মন কেমন করে। বাবা প্রথমে আমার ওপর খুব রাগ করেছিলেন। দু মাস হো'ল তিনি প্রথম চিঠি লিখেচেন—মা ভুলটা তোমরা করনি, আমরাই করেছিলুম,

এখন এ কথাটা বেশ বুঝতে পেরেচি। দিদিকে দেশে পাঠিয়ে বাড়ীটা বিক্রি করতে পারলেই, তোমাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছব। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা চিরজীবন সুখে থাক।

* * * *

লীলা চুপ করিল। মনীষা যে কি বলিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, লীলার মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।